সৎ গুরু লাভ।

বাল্যকাল হইতে আমার সংসারের প্রতি বৈরাগ্য। কিরূপে ভগবৎ লাভ হবে এই চিন্তায় মনকে সর্ব্বদাই ব্যাকুল করিত। আমার বাবা, মা, সন্ন্যাসী গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া সংসারের মধ্যে থাকিয়া যোগ সাধন করিতেন। আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহাদের মনে বড়ই আনন্দ হইত, তাঁহারা বলিতেন ভগবৎ ভক্ত সন্তান সন্তুতি পিতা মাতার প্রার্থনীয়। আশীর্ব্বাদ করি এই ভগবৎ ভক্তি দিন দিন বৃদ্ধি হউক তাঁহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া চির শান্তি লাভ করিও। তাঁহাদের উপদেশ অনুযায়ী বাল্যকাল হইতে ভগবৎ চিন্তা করিতাম। পিতা মাতা স্বর্গলাভের পর সেই বৈরাগ্য ব্যাকুলতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

একদিন আমাদের বাড়ীতে ভগবৎ পাঠ হইয়া ছিল; সেই সময় অনেক সাধু মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন। সে এক আনন্দের দিন তাঁহাদের সেবা যত্ন করিয়া কত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। আমার শরীর সর্ব্বদাই অসুস্থ থাকিত, শুনেছিলাম চন্দ্রায়ণ করিলে দেহ পবিত্র ও ব্যাধী শূন্য হয় সেই আশায় আমি চন্দ্রায়ণের আয়োজন করিয়াছিলাম। একটী মহাপুরুষ বলিলেন "মা, চন্দ্রায়ণ অপেক্ষা দীক্ষা নিলে শরীর ও মনে শান্তি পাবে"। তখন আমার সৎ গুরু লাভের সময় হয় নাই, তাই আমার মনে হল কুল

গুরু ত্যাগ করিতে নাই। এখন কুল গুরু উপস্থিত নাই কিরূপে দীক্ষা হবে। সেই মহা পুরুষ চলে যাবার পর আমার প্রাণে ভয়ানক অশান্তি বোধ হল, আমি যেন কি এক মহারত্ন হারিয়ে পাগলের মত হইলাম। গীতায় আছে সৎ গুরুর কাছে শিক্ষা লইবে, সেই সৎ গুরু আমি ধরে পেয়ে দীক্ষা লইলাম না আমার কি দুর্ভাগ্য। আহার নাই, নিদ্রা নাই, প্রাণে শান্তি নাই দিবা নিশি ঐ এক চিন্তা কোথায় গেলে তাঁর দর্শন পাব। ছয় মাস আমি কি নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়াছি তাহা ভাষায় ব্যাক্ত করা যায় না।

ছয় মাস পরে আমরা কলিকাতায় গিয়াছিলাম সেই সময় একদিন আমার দাদার সঙ্গে সেই মহাপুরুষের দেখা হয়, দাদা আমার অবস্থা জানিতেন তিনি বলিলেন আপনি চলে আসার পর সে আপনার কাছে দীক্ষা লইবার জন্য পাগলের মত হয়েছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন সময় না হলে কিছুই হয় না অক্ষয় তৃতীয়ার দিন খুব ভাল সেই দিন তুমি তাকে নিয়ে আমার আশ্রমে এস দীক্ষা দিব।

দাদা যখন এসে এই সব কথা বলিলেন তখন আমার প্রাণে কত আনন্দ হ'ল করুণাময় অন্তর্যামী রূপে আমার অন্তরের সব বেদনা বুঝে তাই দেখা দিয়ে শান্তির বিধান করলেন। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আমার সৎ গুরুলাভ হ'ল।

দীক্ষার পর আরও দুইবার তাঁর শ্রীচরণ দর্শন পাইয়াছিলাম। শেষ বারে তিনি গয়ায় আসিয়া দাদাকে দীক্ষা দিয়া

হিমালয় যাত্রা করিলেন। আমাকে যোগের বিষয় সমস্ত লিখিয়া দিলেন। আমি বলিলাম বাবা যোগের বিষয় আর কিছু লিখিয়া দিন। কি সুমধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন "মা, পালানে গুরু বলে বুঝি সব পুটুলী বেঁধে নিতে চাও? তা হয় না মা, ধীরে২ সাধনার পথে চল্‌তে হয়। মা, আমি হিমালয় যাব সেইজন্য বুঝি তোমার চিন্তা হয়েছে। মা, আমি হিমালয় থাকি আর যেখানেই থাকি তোমার যখন যা আবশ্যক হবে তুমি পাবে। তোমার ঐকান্তিক গুরুভক্তি বলে আমি বলছি তুমি মা ব্রহ্মময়ীকে পেয়ে চির আনন্দময়ী হবে, তোমার কোন অভাব থাক্‌বেনা"।

সেই বাক্যের উপর বিশ্বাস ক'রে আজ ৩৭।৩৮ বৎসর আমি সাধনার পথে চল্‌ছি। আমি জানি, আমার গুরুবাক্য কখনও মিথ্যা হবেনা। আমি কখন কোন সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট কোন ক্রীয়া লই নাই। আমার গুরুদেব যাহা দিয়াছিলেন তাহাই সাধনা করিয়াছি। আমার যখন যাহা পাইবার সময় এছে গুরুর কৃপায় আমি তাহা লাভ করিয়াছি। দয়াময় গুরুদেবের অপার করুণা তিনি আমার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে "যোগমার্গ সোপানে" উত্তোলন করিয়াছেন। গুরুদেব বলিয়া ছিলেন "মা, যখন তোমার ভিতরের তীর্থ দর্শন হবে, সেই সময় একবার বাহিরের তীর্থ দর্শন করিও, আর হোম করিও"।

আমি বলিলাম বাবা আমি কাঙ্গালিণী, আপনি দয়া করিয়া সময় বুঝিয়া লইয়া যাইবেন। সেই গুরু-কৃপাতে আমার তীর্থ দর্শন। সেইজন্য গুরুদত্ত "আনন্দময়ী" নাম এই পুস্তকে দিলাম।

কেন গুরুদেব হোম করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য তখন বুঝি নাই এখন এইটুকু বুঝিলাম, নিত্য জ্ঞানাগ্নিতে কামনা, বাসনা, চিন্তা, ভয়, দুর্ব্বলতা, মায়া, মমতা, পাপ, পূণ্য, জ্ঞান, অজ্ঞান, যা কিছু আছে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদয় আহুতী দিয়া আপনাকে গুরু পাদ্ম-পদ্মে লীন্ করিতে হইবে। সেইজন্যই গুরুদেবের এই হোমের আদেশ।

সাধনার পথে কত ঘাত, প্রতিঘাত, বিঘ্ন, বিপদ সহিতে হয়। গুরুদেব এ দাসীকে কত রকম পরীক্ষা করিয়াছিলেন তিনিই আবার দয়া করিয়া সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার অপার করুণা ভাষায় ব্যাক্ত করা যায়না।

গুরুদেবের অপার মহীমা অনেকবার অনুভব করেছি, একবার এমন একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

একদিন আমার একটী প্রাণের বন্ধু আমাকে বলিলেন ভাই, গোরক্ষণীতে একটা মহাপুরুষ আছেন তাঁকে দর্শন করিতে যাবে? আমি বলিলাম সাধু-মহাপুরুষ দর্শন করিব সেত অনেক সৌভাগ্যের কথা—যাইব।

গোরক্ষণী বাবার আশ্রমে গেলাম, কি সুন্দর মনোহর আশ্রম চারিদিকে নানাবিধ ফল ফুলের বাগান, শিবের মন্দির, তাহার পার্শ্বে সুবৃহৎ আশ্রম। একখানি খুব বড় ঘর সেই ঘরে বেদীর উপর বাবা বসিয়া আছেন, বাবার আনন্দময় মূর্ত্তী দেখিয়া মনে পড়িল কাশীর ভাস্করানন্দ স্বামীকে এ মূর্ত্তীতে সে মূর্ত্তীতে কোন প্রভেদ নাই।

আমরা গিয়া বাবার চরণে প্রণাম করিলাম। আমার বন্ধু বলিলেন "বাবা ইনি আমার বন্ধু, ইঁহাকে কিছু ক্রীয়া দিতে হবে"।

বাবা বলিলেন না ক্রীয়া দিবনা। আমার বন্ধু বলিলেন "কেন বাবা আপনিত অনেককে ক্রীয়া দিয়াছেন তবে ইঁহাকে কেন দিবেন না"। বাবা বলিলেন আমার ইচ্ছা। তারপর আমাকে একা একটী ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "মা তোমাকে ক্রীয়া দিবনা বলেছি সেজন্য কি তোমার মনে কষ্ট হয়েছে"? আমি বলিলাম না বাবা আমার মনে কষ্ট হয় নাই, আমার গুরুদেব আমার কোন অভাব রাখেন নাই। আমি শুধু আপনার চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। বাবা বলিলেন মা তোমার গুরুদেব তোমাকে উত্তম পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তুমিও ঠিক পথে চলিতেছ। মা, আমিত গুরুগিরি করিতে আসি নাই। তুমি ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে উঠিতেছ, তোমার ২।৪ টী সিঁড়ি বাকি আছে, আমি তোমাকে বলিব এটা ব্রহ্মযোনী নয়, তুমি নেমে এস, তোমাকে নামাইয়া সমস্ত সহর ঘুরাইয়া আবার এইখানে আনিব তাহাতে তোমার কত কষ্ট হবে? সেইজন্যই বলিলাম আমি ক্রীয়া দিবনা। মা, তোমাকে আমি একটী কথা বলিতেছি তাহা মনে রাখিও কোন সাধুর কাছে কোন ক্রীয়া লইও না। অনেক ভণ্ড সাধু আছে, গুরুগিরি করিবার জন্য তোমাকে কষ্ট দিবে, সেইজন্য তোমাকে সাবধান করিয়া দিলাম।

সর্ব্বদাই তাঁর চরণ দর্শন করিতে যাইতাম, তাঁর অপার করুণায় প্রাণে বড়ই শান্তি পাইতাম।

এখন সে দয়াময় মহাপুরুষ এ জগতে নাই।

গুরুর কৃপায় তীর্থ দর্শন।

শ্রীশ্রীঅভয়ানন্দ স্বামী গুরুদেব চরণে
ভকতি কুসুম মালা করি নিবেদন।

শ্রী গুরু চরণে করি আত্ম সমর্পণ।
শ্রী চরণে যেন সদা থাকে মম মন॥
গু ণের অতীত তুমি শ্রীগুরু আমার।
রু কারে আলোকি আছ নিখিল সংসার॥
দে খা দিও এ দাসীরে অন্তিম সময়ে।
ব লিতেছি এই মম কামনা হৃদয়ে॥
চ ন্দন ভক্তিতে ঘষি লয়ে স্বযতনে।
র ঞ্জিব চরণ তব এই সদা মনে॥
ণে হারি রক্তিম পদ ঝরে প্রেম জল।
ভ ব পারাবারে "গুরু চরণ সম্বল"॥
ক খন বঞ্চিত যেন না হই কৃপায়।
তি মীরে আবৃত মম এ' অন্ধ হৃদয়॥
কু বাসনা দূর করি থেক সদা পাশে।
সু খ দুঃখ ঘুচাইও সব অভিলাষে॥
ম ম ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী গুরু কৃপা বলে।
মা লা গাঁথি দিব তব ও চরণ তলে॥
লা ঘব হয়েছে সব গুরুর কৃপায়।
ক রুণা অপার তব বর্ণনা না যায়॥
রি ক্ত হৃদয়ে মম নাহি কিছু হায়।
নি বেদিব তব দেব ওই রাঙ্গা পায়॥
বে দনা ব্যথিত চিত্তে "শ্রীগুরু আমার"।
দ য়া কোরে দিলে কত করুণা অপার॥
ন তুবা কি হ'ত মম ভাবি বার বার।
ভব পারাবারে তুমি হও কর্ণধার॥

গুরু কৃপা।

পতিত পাবন দীনবন্ধু দয়াময়,
ভাবিয়ে করুণা তব শীহরে হৃদয়।
কাঙ্গালিণী বলে দেব কত ভালবা[illegible]।
যখন যা মনে হয় পুরাও সে [illegible]।
স্থূল দেহে যবে তুমি লইলে [illegible]
কাঁদিয়ে পড়িনু তব লুটাইয়ে [illegible]য়,
চির অভাগিনী আমি কেহ [illegible] কায়
দয়া ক'রে দিলে প্রভু চরণে আশ্রয়।
চরণ বঞ্চিতা মোরে কো'রনা কখন,
গুরু পাদ্ম-পদ্ম শুধু ভরসা এখন।
কি মধুর স্নেহভাবে বুঝাইলে মোরে
কেন মা, ব্যাকুল হয়ে কাঁদিছ কাতরে?
দিয়েছি যে "যোগ দীয়া" সেই যোগ ধ্যানে
গুরুপদ সদা তুমি হেরিবে নয়নে।
ঐকান্তিক গুরুভক্তি আছে যার প্রাণে
সেই শিষ্য থাকে সদা গুরু সন্নিধানে।
গুরু পাদ্ম পদ্ম তুমি ক'রয়াছ সার
কিছুরি অভাব তব রহিবেনা আর,
"জগদম্বা" মাকে তুমি পাইবে ত্বরায়
অবার্থ না হবে কভু জানিবে নিশ্চয়।
দক্ষিণা স্বরূপ তব কামনা বাসনা,
লইয়াছি আমি সব করি নির্ব্বাসনা।

ভিতরের তীর্থ যবে ক'রিবে দর্শন,
বাহিরের তীর্থ তবে করিবে ভ্রমণ।
অন্তরে বাহিরে তব হবে একাকার
তখনি বুঝিবে তুমি "অনিত্য" সংসার,
নিত্যানন্দে লভি হবে নিত্যানন্দময়।"
গুরু দত্ত নাম তব থাকিবেক ওই।
"হিমালয়" যাব বলি ভাবিতেছ মনে
বঞ্চিতা হইবে তবে গুরু দরশনে ?
গুরু তব অন্তরেতে থাকিয়ে "জাগ্রত"
কাটাবেন "মায়া মোহ" বাসনা নিয়ত।
বিশ্বাসে নির্ভর করি থাক সর্ব্বক্ষণ
গুরুবাক্য কভু নাহি হইবে লঙ্ঘন।
অপার "গুরুর কৃপা" বর্ণিতে না পারি
বহু পূণ্যে পাইয়াছি গুরু পদ তরী।
ধন্য মম গুরুদেব ধন্য কৃপা তাঁর
সঞ্চিত বাসনা যত অন্তরে আমার।
একে একে পূর্ণ ক'রে বাসনা সকল
"নির্ব্বাসনা" হৃদি আজি শান্তি নিরমল।

কি আনন্দ লভিয়াছি গুরুর কৃপায়,
গুরু-কৃপা কভু নাহি বর্ণনা না যায়।

———

অবতরণিকা।

বর্ত্তমান কালে বঙ্গ ও অন্যান্য প্রদেশে বিদুষী মহিলাগণের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। নানাবিধ বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবিস্তারও যথেষ্ট হইতেছে। কিন্তু রমণীকে যে উদ্দেশ্যে ও কারণে পুরুষের "সহধর্ম্মিণী" "অর্দ্ধাঙ্গিণী" "জীবনসঙ্গিনী" ও "গৃহিণী" ইত্যাদি বাক্যে অলঙ্কৃত করা হয়, তদুদ্দেশ্যে জ্ঞান-বিস্তার ও শিক্ষা কিরূপ হইতেছে তাহা উপলব্ধি করা বড় সুকঠিন। বর্ত্তমান কালে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বাস্তবিক কিরূপ জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার আবশ্যক তাহাই এখন বিষম সমস্যা। একেত বর্ত্তমান কালে পুরুষদিগের শিক্ষাপদ্ধতি একপ্রকার ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানাদির অভ্যাসশিক্ষা বর্জ্জিত। তাহার উপর নারীশিক্ষার রক্ষা যদি সেই প্রকার হয়, তাহা হইলে ইহার পরিণাম বিশেষ ভাবে চিন্তনীয় ও বিচারণীয় - উভয় পক্ষের শিক্ষাবিষয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতীচ্যের সহিত জড়িত থাকিবে। উভয় প্রকার শিক্ষার মধ্যে কতটুকু বরণীয় ও কতটুকু বর্জ্জণীয় তাহা এই সময়ে সুধীগণের বিশেষভাবে চিন্তা ও অনুষ্ঠান করিবার কথা। জ্ঞানশিক্ষা ও অনুষ্ঠানের সহিত ধর্ম্মকার্য্য শিক্ষার সম্মিলন ক্রমশই দিন দিন বিরল হইয়া পড়িতেছে।

লেখিকা কোন প্রকার বিদ্যালয় বা কোন শিক্ষকের অধীনে শিক্ষিতা নহেন। স্বীয় পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনগণের যত্নে ও উৎসাহে উত্তরোত্তর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। অথচ গুরুজনদিগের প্রবর্ত্তনায় এই শিক্ষার সঙ্গে২ তাঁহার গৃহস্থলী নানাবিধ সংসার পরিদর্শন কার্য্যে যোগ্যতা এবং ধর্ম্মশিক্ষা ভাব ক্রমশই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। একাধারে তাহার এতগুলি গুণের সমাধান এবং তাঁহার প্রগাঢ় গুরুভক্তি, ধর্ম্মাষ্ঠান ও লিখনে তাঁহার ভাব প্রকাশ ও ঐটুকু শিক্ষায় ঐরূপ লিখিবার ভনিতা দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছি যে এই "অবতবনিকা" টুকু না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

যদি আপনারা বিদুষী রমণীরা গ্রন্থে ও পত্রিকাদিতে ভ্রমণ বৃত্তান্ত এইরূপ জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মভাব ফুটাইতে পারেন—যদি তীর্থযাত্রিদিগের তীর্থ-ভ্রমণে মনকে প্রস্তুত করণ বিষয়ে অন্যান্য পথের বিষয়ে এই গ্রন্থ যদি কিছুমাত্র সহায়তা করিতে পারে, তাহা হইলে লেখিকার শ্রম সার্থক হইবে সন্দেহ নাই।

আর সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ যদি নিজগুণে ক্ষমা করিয়া ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লয়েন; তাহা হইলে তিনি চির কৃতজ্ঞা রহিবেন সন্দেহ নাই। অলমিতি বিস্তারেন।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘোষ।

ভূমিকা।

শ্রীগুরু কৃপায় তীর্থদর্শন লিখিবার ইচ্ছা আমার অনেক দিন হইতে ছিল, কিন্তু এত শীঘ্র যে লেখা হইবে তাহা কখন আশা করি নাই।

শ্রদ্ধাস্পদ সোদর প্রতিম শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশ চন্দ্র ঘোষ জেলা স্কুলের অবসর প্রাপ্ত হেড মাস্টার মহাশয় এ বিষয়ে উৎসাহ ও মার্গ প্রদর্শন না করিলে ইহা সম্পন্ন হইয়া উঠিত না। তাঁহারই আদেশে, চেস্টায়, যত্নে ও তিনি পুস্তকের প্রুফ সংশোধনের প্রভৃতি কার্য্যে সহায়তায় এত শীঘ্র পুস্তক জন সাধারণে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আজমীর, জয়পুর, কুরুক্ষেত্র এ কয়েকটি স্থানের লেখা খুব কম হইয়াছে। কারণ, আমি যাঁহাদের সঙ্গে তীর্থ দর্শনে গিয়াছিলাম, তাঁহারা এ সব স্থানে এক বেলা কিংবা একদিন থাকিয়া যে টুকু দেখা আবশ্যক সেই টুকু মাত্র দর্শনাদি করিয়াছিলাম, আমিও তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে ও দেখিতে পারি নাই। সেইজন্য পুস্তকে সেই অল্প টুকু মাত্র লেখা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ স্থানের চারিদিকে ভ্রমন না করিলে সেই স্থানের বর্ণনা করা যায় না। সেইজন্য পুস্তকের যদি কোন দোষ হইয়া থাকে পাঠক পাঠিকাগণ নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন।

বদ্রিনারায়ণের আমরা সকলেই নূতন যাত্রী চটী ও মাইল পাণ্ডা ও ছড়িদারদের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি সেইরূপ লেখা হইয়াছে, ইহাতে কম বেশী হইতে পারে।

বদ্রিনারায়ণের পথের সুমনোহর দৃশ্যাবলী পথেই বসিয়া লিখিতে পারিলে অতীব মনোহর হইত। কিন্তু আমরা শুদ্ধ কালে দর্শন করিব বলিয়া প্রাণপণে চলিয়া ছিলাম। কোথাও একটু বিশ্রাম করি নাই। [illegible]টার সময় চলিতে আরম্ভ করিতাম, বেলা ১২টার সময় একটা চটীতে রন্ধন আহারাদি করিয়া আবার চলিতাম, সন্ধ্যার সময় চটীতে আসিয়া বিশ্রাম করিতাম। সেইজন্যই বোধহয় সকল কথা ও ভাব ভাল রূপ ফুটে নাই।

আশাকরি সদাশয় পাঠক পাঠিকাগণ এ অজ্ঞ লেখিকার লেখাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া যে সমস্ত ভুল আছে সে সমুদয় অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে মৎ প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তিক খানি যদি কোন তীর্থযাত্রীগণের কিঞ্চিৎমাত্র উপকারে বা কাজে লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে এই সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী।

তীর্থাদির সূচীপত্র।

কলিকাতার কালীঘাট দর্শন।

কালীঘাট যাইতে কোন কষ্ট নাই। হাওড়া ষ্টেশন হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে। হাওড়া হইতে কালীঘাট যাইতে ট্রাম, বাস, মোটার গাড়ী সমস্তই পাওয়া যায়।

কালীঘাটে মা কালীর মন্দির আছে। কালীঘাটের কালীমাতা ৫১টী পীঠস্থানের ১টী পীঠস্থান। এখানে সতীর দক্ষিণ পদের চারিটী অঙ্গুলী পড়িয়াছিল।

মন্দিরটী বৃহৎ, দেখিতে অতি সুন্দর। মন্দিরের ভিতরে মা কালী চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, রক্তবস্ত্র—পরিহিতা, লোলজিহ্বা, মুক্তকেশী, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ-কারিণী, সদা-হাস্যযুক্তা মা, মন্দির আলো করিয়া বিরাজ করিতেছেন। মায়ের এই আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিলে ভক্ত হৃদয় আনন্দে আত্মহারা হইয়া মায়ের পাদ - পদ্মে লীন্ হইতে চায়।

মা, যেমন কালী মূর্ত্তিতে ভুবন আলো করিয়াছ, তেমনি আমার হৃদয়ের সব অজ্ঞান অন্ধকার দুর করিয়া, জ্ঞানের আলোকে আলোকিত ক'র মা! মা, প্রত্যহ তোমার কাছে কত বলিদান হইতেছে,। তোমার "বলির" বিধান দেখিয়া বলিতেছি মা! তুমি দয়া করিয়া আমার সব ষড় রিপু গুলিকে বলিরূপে গ্রহণ ক'র মা! মন্দিরে বসিয়া দেখি কত লোক সমারোহ করিয়া কত আয়োজন করিয়া তোমার পূজা করিতেছে। আমারত মা! কিছুই নেই, আমি কি দিয়ে তোমার পূজা করিব? তবে যদি দয়া করিয়া একটু শ্রদ্ধা

ভক্তি দাও, তাহা হইলে সেই ভক্তি-প্রেম-অশ্রুজল গঙ্গাজল রূপে তোমার রাঙ্গা চরণ ধৌত করিয়া মনজবা বাসনা নিয়ে তোমার পাদ পদ্মে পুষ্পাঞ্জলী দিব। অন্তরের কামনা, বাসনা, আমিত্ব, অহংভাব এই সব দিয়া আমার জগত জননী মহাশক্তি রূপিণী মায়ের পূজা করিতে চাই মা।

আলো কোরে কে মা তুমি ভুবন মোহিনী?
কালীঘাটে বিরাজিছ করাল বদনী।
তোমার চরণ আশে, এসেছি মা তব পাশে,
যা কিছু আছে মা দিতে চরণে তোমার,
আনিয়াছি অহংভাব আমিত্ব আমার।
কাম, ক্রোধ, রিপুগণে, এনেছি মা বলিদানে,
ভকতি চন্দন দিয়ে মনজবা ফুলে,
পুষ্পাঞ্জলী দিব মাগো ও চরণ তলে।
মম প্রেম-অশ্রুজল, হবে তায় গঙ্গা জল,
ধুইব চরণ তব বড় আশ মনে,
তনয়ার পূজা মাগো লহ কৃপা গুণে।

মা কালীর মন্দিরের পাশে শ্যামসুন্দরের মন্দির। শ্যামসুন্দর প্রেমময় মূর্তিতে যুগলরূপে বিরাজ করিতেছেন।

মন্দিরের সম্মুখে আদি-গঙ্গা আছে। আদি-গঙ্গা স্নানে বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। ভাগীরথী আগে এই খাড়ি দিয়া বহিতেছিলেন, তাই আজিও সেই ধারণা এখন বজায় রহিয়াছে।

মন্দিরের বাহিরে ও মন্দিরের প্রাঙ্গনের মধ্যে অনেক ফুলমালা ও ডালার দোকান আছে। মায়ের পূজা, যাঁহার যেমন ইচ্ছা, সে সেই রকম পূজা দিয়া থাকেন। কেহ ।/০ আনায়, কেহ /৫ পয়সার ডালা দিয়া পূজা দেয়। ডালাতে কতকগুলি ফলের কুচা, সন্দেশ, ২১ টা পাতায় একটু সিঁদুর থাকে। কেহবা ১০ ভোগের জন্য দেয়। আর যাঁহারা যেরূপ মানসিক পূজা দিতে আসেন তাহাদের যাহার যেরূপ মানসিক সেইরূপ পূজা দিয়া থাকেন. যথা—ছাগ বলি শাঁখা শাড়ী, নথ, জবার মালা, মায়ের ভোগ ইত্যাদি।

মায়ের মন্দিরে প্রবেশের সময় দরজার কাছে পাণ্ডারা দাঁড়াইয়া থাকেন পয়সা না দিলে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন [illegible] দিগকে ২১ টা পয়সা দিতেই হয়

মায়ের দর্শন করিয়া নকুলেশ্বর দর্শন করিতে হয়। নকুলেশ্বরের মন্দিরের নিকট ফুল বেলপাতা ভাঁড়েতে করে গঙ্গাজল বিক্রয় হয়। তাহা লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দর্শন, পূজাদি করিতে হয়।

আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজার সময় মা কালীর মন্দিরে পূজার সমারোহ দেখিতে বড়ই সুন্দর। মহাষ্টমীর দিন অসংখ্য বলি হয়। পূজার দশে নাটমন্দির ভরিয়া যায়। তিন দিন সর্বক্ষণ লোকের ভীড়, সমস্ত দিন মায়ের পূজা হইতেছে। বিজয়া দশমীর দিন সিঁদুর খেলা দেখিতে বড়ই সুন্দর। সেদিন কালো মা, একবারে রাঙ্গা হন। বিজয়ার দিন সকাল হইতে রাত্রি ৮।৯ টা পর্যন্ত মেয়েদের ভীড়, মেয়েরা সকলে সিঁদুর মায়ের

কপালে দিয়া তারপর মেয়েরা সিঁদুর লইয়া সমস্ত সধবা মেয়েদের সিঁথীতে সিঁদুর দিয়া সিঁদুর খেলা করে। বিজয়ার দিন নাটমন্দিরে নানাবিধ দ্রব্য,—শাঁখা, শাড়ী, আরসী, চিরুণী, আলতা, মাথাঘষা, পানের মসলা ইত্যাদি ডালায় করিয়া সাজান হয়।

কালীঘাটে আজকাল অনেক হালদারগণ যাত্রীদের প্রতি খুব যত্ন করিয়া দর্শনাদি করান। আবার অনেক অর্থ লোলুপ পাণ্ডা আছেন; তাঁহারা যাত্রীদের প্রতি যৎপরোনাস্তিক পীড়ন করেন।

কালীঘাটের পশ্চিমে ভুকৈলাসের রাজভবন ও ভুকৈলাসের শিব মন্দির আছে।

কলিকাতা বাসিনী রমণীরা পৌষ মাসে ও চৈত্র মাসে মায়ের দর্শনাদি করিয়া থাকেন। সাগর মেলার পূর্ব্বে খুব ভিড় হয়। আর দীপান্বিতা অমাবস্যার দিনে ভিড়ের ত কথাই নাই।

গঙ্গাসাগর!

গঙ্গাসাগরে আমরা ডায়মণ্ড হারবার হইতে নৌকায় গিয়াছিলাম। বেলা ২ টার সময় নৌকা ছাড়িল।

গঙ্গার কিনারে কিনারে নৌকা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। আমি মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "নৌকা এত ধীরে ধীরে যাইতেছে, এ নৌকা কবে পৌঁছিবে?" মাঝি বলিল "এরূপ ভাবে নৌকা চলিলে ২।৩ দিন লাগিবে। আর মাঝ গঙ্গা দিয়া নৌকা বাহিলে আজ রাত্রেই পৌঁছিবে। মাঝ গঙ্গা দিয়া নৌকা

লইয়া গেলে, তরঙ্গ দেখিয়া অনেক আরোহী ভয় পায়, সেইজন্য কিনারে নৌকা বাহিতেছি"।

মানুষ চিরদিন সংসার সমুদ্রে হাবু ডুবু খাইতেছে। সেসময়ত মনে ভাবেনা ভগবানের চরণ কিনারা ধরিয়া সংসার সমুদ্রে ভাসি, তাহা হইলেত আর জীবন তরীর কোন ভয় থাকিবেনা।

আমি মাঝিকে বলিলাম, এখনত কোন জাহাজ বা ষ্টীমার নাই, এসময়ে যদি নৌকায় কোন ভয় না থাকে তাহা হইলে তুমি গঙ্গার মাঝ দিয়া নৌকা বাহিয়া চল।

আমার কথা শুনিয়া মাঝির খুব আনন্দ। যত শীঘ্র পৌঁছিতে পারে, তার পক্ষে ভাল। মাঝি মাঝ গঙ্গায় নৌকা বাহিতে লাগিল।

আরোহীরা সকলে শয়ন করিয়াছেন। আমি সে সময় নৌকার ছাদে আসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম, চাঁদের আলোতে গঙ্গার কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। তাহা দেখিয়া মন বিমোহিত হয়, মনে হয় বুঝি প্রকৃতির সমস্ত শোভা এই গঙ্গার জলে।

চাঁদের কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে। যখন নৌকা মাঝ গঙ্গায় আসিল, তখন গঙ্গার কূল কিনারা কিছুই দেখা যাইতেছেনা। কেবল মাত্র মাথার উপর অনন্ত সুনীল আকাশে বৃহৎ চন্দ্রমা হাসিতেছে। এত বড় চাঁদ আমরা কখন ঘরে বসিয়া দেখি নাই, চাঁদ যেন এক খানা বড় আলোর মত। আর গঙ্গার উপর নৌকা খানি যেন ঠিক মোচার খোলার মত,—কখন উঠিতেছে, কখন ভাসিতেছে। সে সময় আমার প্রাণে যে কি আনন্দময় হইয়াছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সে সময় মনে হইল "আনন্দময়!

তোমার সসীমত্ব টুকু অসীমে লীন্ হইয়া কি এক অভিনব অসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছ!—যার আদি অন্ত কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না।"

সসীম হয়ে অসীমে মিশিলে।

তুমি সসীম হইয়া, আহা অসীমে মিশিয়া,
অসীম ব্রহ্মাণ্ড ছবি দিয়াছ আঁকিয়া!
তব এ ছবি দেখিলে, প্রেমে মন প্রাণ গলে,
বহিছে তরঙ্গ বারি মন বিমোহিয়া।
বিমল সাগর, জল, করিতেছে কল কল,
এ ক্ষুদ্র তরণী তাহে যাইছে ভাসিয়া।
এই তরঙ্গ হিল্লোলে, "তরি" হেলে দুলে চলে,
মনে হয় তরী বুঝি যাইবে ডুবিয়া।
ওহে তুমি কর্ণধার, তবে কি ভয় আমার,
দিয়েছি জীবন তরী তোমার চরণে,
যায় যদি তরী ডুবে, তব চরণ অর্পণে,
আমি ত নিশ্চিন্ত আছি তব পদ ধ্যানে॥

রাত্রি ১২ টার সময় নৌকা গঙ্গাসাগরের দ্বীপের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। সে রাতে আমাদের নৌকায় থাকা হইল পরদিন সূর্য্যোদয়ের সময় কি অপূর্ব্ব শোভা, মনে হইল যেন জলের ভিতর হইতে রক্তিমাবর্ণে কত বড় হইয়া সূর্য্যদেব অপূর্ব্ব ছটায় ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতেছেন।

সকালে আমরা নৌকা হইতে নামিলাম। তাহার পর ালুর উপর হোগলা দিয়া ঘর বাঁধা হইল।

কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সমস্ত জিনিষের াকান আসে।

পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরের মেলা হয়, এই নেদিনের মেলাতে সাগরদ্বীপের ধ ধূ বালুকাময় মরুভূমি কেবারে নগরে পরিণত হয়।

নানাবিধ খাবারের দোকান, মনোহারীর দোকান, কাপড়, ধর ইত্যাদির দোকানের বাজার বসে।

পুলিশ, থানা, তার আফিস, হাঁসপাতাল, সেবাসমিতি াভৃতি স্থাপিত হয়। অনেক ভলেন্টিয়ার থাকে, সেজন্য যাত্রীদের োন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না যদি কেহ হারাইয়া যায়, লেন্টিয়াররা খুঁজিয়া তাহাদের আত্মীয়গণের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

সঙ্গমের নিকট একটা ঘরের টাটীর আশ্রয়ে বড় পুরাতন ধ্বযা পিল মুনির মূর্ত্তি আছে, দক্ষিণে রাজা ভগীরথের ও বামে মানন্দ জীউর মূর্ত্তি আছে।

যাত্রীরা সঙ্গমে স্নান করিবার সময় সমুদ্রে নারিকেল, ফল, ল, পঞ্চরত্ন দিয়া থাকেন ও কপিল মুনির দর্শন ও পূজা করেন।

কপিল মুনির স্থান হইতে কিছু উত্তরে একটী মিস্ট জলের ষ্করিণী আছে, সেই জল সকলের পান করিবার জন্য। সেখানে র্ব্বদা লোক পাহারা দিতেছে, কোন লোক স্নান বা কাপড় াচিতে পাইবেনা।

ঠাকুরের চরণে পুষ্পাঞ্জলী।

শ্রী চরণে প্রণিপাত করিয়ে তোমায়
শ্রী চরণে যেন মতি থাকে নিরন্তর।
রা ম কৃষ্ণ রূপে তুমি আসিয়ে ধরায়
ম ন প্রাণ কেড়ে নিলে সকলের হায়।
কৃ পা করি সর্ব্বজীবে করিয়ে উদ্ধার
শ মনের ভয় হতে করিলে নিস্তার।
ন হিলে জগৎ গুরু হইবে কেমনে
দে বতা চরণ পূজা করে সর্ব্বজনে।
ব র্ণিতে না পারে কেহ তব কৃপারাশী
চ রণে আশ্রয় তাই মাগিতেছে দাসী।
র হিবেনা ভব ভয় চরণ কৃপায়
নে হারি অন্তরে যেন সতত তোমায়।
ফু টাইয়া দাও দেব জ্ঞানের নয়ন
ল য়ে "পুষ্পাঞ্জলী" করি চরণে অর্পণ।
মা নসে গুঞ্জিয়ে বাসনা কুসুম দিয়ে
লা ঘব হউক সব তব পদ পেয়ে।
নি রখি মন্দির এই সাধন আসন
বে দনা ব্যথিত চিত্তে জুড়াবার স্থান।
দ য়াময় "অবতারে" জীবে করি ত্রাণ
ন হিলে জীবের গতি কি হ'ত এখন।

—:•:—

দক্ষিণেশ্বরের নিকট আড়িয়াদহে আদ্যাপীঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
দেবের শিষ্য ৺অন্নদা ঠাকুরকে স্বপ্নাবেশে আদেশ হয় মন্দির করিয়া
সেখানে আদ্যামাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া ৪টী আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।
একটী মাতৃ আশ্রম, একটী কুমারী আশ্রম, একটী কুমার আশ্রম,
সেখানে বালকদের বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়। কুমারী
আশ্রমে কুমারী বালিকাগণকে বিদ্যা শিক্ষা ধর্ম্ম শিক্ষা ও নানাবিধ
শিল্প শিক্ষা ইত্যাদি দেওয়া হয়, কুমারী আশ্রমে বালিকাদের শিক্ষা
আচার ব্যবহার দেখিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিয়াছি, ঠাকুরের
কৃপায় আশ্রমের দিন দিন উন্নতি হইলে বড়ই সুখ শান্তিময় হইবে।
সকল বালক বালিকার পিতা, মাতা বা অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য
প্রথম হইতেই বালক বালিকাগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা
দিয়া উন্নত চরিত্র করিয়া তারপর সাংসারিক ও আর্থিক পথ
প্রদর্শিত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পিতা মাতাগণ প্রথম হইতেই
বালক বালিকাদিগকে সাংসারিক আর্থিক ও ভোগ বিলাসের পথে
পরিচালিত করিতেছেন ইহার ফল যে কি বিষময় হইতেছে তাহা
বোধ হয় সকলেই অনুভব করিতেছেন ?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নর-নারীর প্রতি অপার করুণা
স্বপ্নাদেশে মন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া নর-নারীর শান্তির
বিধান করিয়াছেন। মাতৃ আশ্রমে বিধবা, সধবা, অনাথা সকলের
জন্য স্থান আছে। সন্ন্যাসী আশ্রমের সন্ন্যাসীগণ ভিক্ষা করিয়া
আনিয়া, মাতৃগণের, কুমারীগণের, কুমারগণের গ্রাসাচ্ছাদন, বিদ্যা
শিক্ষা, ইত্যাদির ব্যাবস্থা করিতেছেন। এ মহৎ সদনুষ্ঠানে
সকলের কর্ত্তব্য সাহায্য করা।

তারকনাথ ।

কলিকাতা হইতে পশ্চিমে ৩৬ মাইল দূরে তারকেশ্বর। সেওড়াফুলী হইয়া যাইতে হয়। এখানে বাবা তারকনাথের মন্দির, মন্দিরের সম্মুখে নাট্যমন্দির, তাহার পাশে বাবার পুষ্করিণী।

প্রথমে মোহান্তর পূজা হয়। তারপর যাত্রীদের পূজা হয় ১২ টার সময় ভোগ হয়, শৃঙ্গার বেশ হয়। ভোগের পর প্রসাদ মোহান্তর বাড়ী যায়। সেখানে সব সাধু ভোজন হয়।

শিবরাত্রির সময় ও চড়কের সময় তারকনাথে খুব ভীড় হয়।

তারকনাথে বারমাস অনেক নরনারী আসিয়া কঠিন ব্যাধি আরোগ্য হইবার জন্য ধন্না দিয়া থাকেন। নাট্যমন্দিরে লোক ভরিয়া যায়, একটুও স্থান থাকে না। অনেক লোক মন্দিরের দরজায় ও মন্দিরের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।

বৈকালে বাবার মন্দিরে গান হয়।

আমার চোখের অসুখ হইয়াছিল, ডাক্তারগণ বলিলেন আরোগ্য হইবেনা। সেই সময় আমি তারকনাথে ধন্না দিয়াছিলাম, বাবার কৃপায় আমি বেশীদিন কষ্ট পাই নাই। একদিনেই ঔষধ পাইয়াছিলাম। সেই ঔষধে আমার চক্ষু আরোগ্য হয়। তাহারপর ডাক্তারগণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন।

ধন্য দেব তারকনাথ! তাঁর অপার মহিমা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

নবদ্বীপ।

হাওড়া হইতে ই, আই, আর বারহারোয়া ব্যাণ্ডেল লুপ লাইন দিয়া ৬৬ মাইল দূরে নবদ্বীপ। শিয়ালদহ হইতে ই, বি, আর দিয়াও যাওয়া যায়।

নবদ্বীপ চৈতন্য দেবের লীলাভূমি। নবদ্বীপে মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমীর দিন হইতে গান আরম্ভ হয়। সে সময় অনেক ভাল সংকীর্ত্তনের দল আসে। দিনরাত কীর্ত্তন হয়, সেই সময় নবদ্বীপে বড় আনন্দময় বোধ হয়। সেই সময় হইতে ধূলটের মেলা, পূর্ণিমায় শেষ হয়।

সোনার গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, মহাপ্রভু, পঞ্চতত্বের বাড়ী অদ্বৈতের বাড়ী, শচীমাতা, পোড়া মা, বুড় শিব, গুপ্ত বৃন্দাবন, পুরাতন হরিসভায় অপূর্ব্ব রূপে যুগল মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। সে রূপ-মাধুরী দেখিয়া নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না।

নবদ্বীপে অনেক মন্দির আছে, গঙ্গা আছেন, অনেক দেখিবার জিনিষ আছে।

শ্রীবৃন্দাবনের মত এখানেও প্রায় সকল মন্দিরে ভেট দিতে হয়।

ললিতা সখীর আশ্রম খুব বড়, সেখানে অনেক লোক বাস করে।

নবদ্বীপে নামের মহিমা সর্ব্বক্ষণ প্রচারিত হইতেছে। মহাপ্রভুর নামে যে জীব চৈতন্য লাভ করে, তাহা বেশ অনুভব হয়।

লীলাময়! কত রূপে যে সর্ব্বস্থানে কত লীলা করিয়াছ, সে সব লীলাভূমিত আমার বর্ণনা করিবার শক্তি নাই। বর্ণনা

ইহা গচ্ছ ইহ তিষ্ঠ, অধিষ্ঠান স্থির শ্রেষ্ঠ,
গ্রহণ্য গ্রহণ্য বলে আত্ম সমর্পিয়ে
জাগো ওমা "কুণ্ডলিনী" জাগো এ হৃদয়ে
ইড়া, পিঙ্গলা সুষম্নায় গাঁথিয়ে মালা
পরায়ে তোমারে, নাশি ত্রিতাপের জ্বালা।
ধূপ দীপ তেজ তত্বে, চন্দনে পৃথিবী তত্বে,
কুসুমে আকাশ তত্বে মূল মন্ত্র লয়ে
অমৃত নৈবেদ্য সুধা আচমন দিয়ে।
রেখেছি বলির তরে রিপু ষড়জন
কামনা বাসনা যত করে জ্বালাতন।
জ্ঞানের অনল জ্বেলে, দিও সবে হোমানলে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম ঘৃতে মনোময় স্রুক্ লয়ে,
যজ্ঞ শেষ হয় যেন পূর্ণাহুতি দিয়ে।
শিরসী সহস্র দলে বসায়ে যুগলে
হংসী সহ হংস মাগো মিলন হইলে
শুন ওগো মা বিমলা, দূর করি মনো মলা,
যুগল রূপেতে হেরি যুগল নয়নে
মিশে যাই যেন মাগো ও রাঙ্গা চরণে।
পূজিব সহস্র দলে ছত্র ধরি শিরে
চরণেতে "মন অর্ঘ্য" দিব ভক্তি ভরে
নিরন্তর আঁখি মোর, হেরিবে চরণ তোর,
প্রেম ভক্তি অশ্রুজলে ধুইয়া চরণ
যা কিছু দিয়েছ, পদে করিব অর্পণ।

এস এস মা "বিমলা" ডাকি মা কাতরে
পূজা আয়োজন কোরে, আছি বসে সকাতরে
আঁধারে তিমির নাশি আসিবে জননী
পোহাবে আমার তবে এ দুঃখ রজনী।
"জগন্নাথো স্মৃতো ভৈরব, বিমলা স্মৃতো ভৈরবী"
এই মহা তীর্থ মাঝে হেরি মহা ছবি
আনন্দেতে আত্মহারা, বহিছে মা অশ্রুধারা,
অব্যক্ত অচিন্ত্য রূপ বর্ণনা না যায়
ও চরণে লীন করি রাখ মা আমায়॥

এখান হইতে দর্শন করিয়া নির্গত হইয়া সোপানাবলী বরোহন করিয়া সম্মুখে মুক্তি মণ্ডপ, নরসিংহ মুর্ত্তি দর্শন করিয়া ।।হিণী কুণ্ডের—জল শির প্রক্ষেপণ করিয়া বিমলা মায়ের মন্দিরে বেশ করিতে হয়। এখানে মায়ের বরাভয় করা প্রসন্না চিন্ময়ী র্ত্তি। সতীদেহ হইতে উৎপন্ন ৫১ পীঠের ইহা একটী পীঠ স্থান। খানে দেবীর নাভী,—দেবী বিমলা।

" জগন্নাথস্তু মহা ভৈরবঃ
বিমলা যত্র ভৈরবী "

অনেকে বোধ হয় জানেন না যে জগন্নাথজীর ভোগ কালে ন্দিরের ভিতর হইতে মায়ের প্রতি নিবেদন হইলে মহাপ্রসাদ ইয়া তবে বাহিরে আসে। এদিকে ঠিক সেই সময়ে বিমলা য়ের মন্দিরে ভোগ আরতি হয়।

জগন্নাথদেবের পূজা পদ্ধতি সমস্তই তান্ত্রিক মতে হইয়া কে আর দেবীপক্ষের মহাষ্টমীর দিন নিশীথ সময়ে বিমলা মায়ের নাবিধ তান্ত্রিক পূজা হইয়া থাকে। সে সময় যাত্রীদিগের [illegible] নাই।

শ্রীচৈতন্য দেবের মাহাত্ম্যে মহাপ্রসাদ সেবনে জাতিভেদ উঠিয়া গিয়াছে। আহা! সর্ব্বস্থানে সকল দেবদেবীর মন্দিরে প্রসাদ সেবার যদি এইরূপ নিয়ম হইত!

এখান হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণে একাদশীর মন্দির, বামে বাসুদেব, গোষ্ট, যুগল মূর্ত্তি, সরস্বতী, সত্যভামা প্রভৃতির মন্দির দর্শন করিয়া লক্ষ্মীর মন্দিরে আসিতে হয়, এখানে দর্শন করিয়া সম্মুখে নাট্য মন্দিরে বসিয়া নানাবিধ জপ ও ইষ্ট চিন্তা করিতে হয়।

তাহার পর এখান হইতে উঠিয়া দক্ষিণকালীকা, সূর্য্য মন্দির, উত্তর দ্বারে চৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করিয়া প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া দেব মন্দিরের চূড়ায় অষ্টধাতু নির্ম্মিত চক্রধ্বজ দর্শন করিতে হয়, ঐ চূড়ার উপরে প্রতি একাদশী তিথিতে মহাদীপ দান অতীব মনোমুগ্ধকর।

এখান হইতে প্রথম উত্তর দরজা পার হইলেই, বামে "বৈকুণ্ঠ" দক্ষিণে "পাতালেশ্বর মহাদেব" আছেন। দ্বিতল গৃহ, বৈকুণ্ঠে যাত্রীগণকে সুফল দেওয়া হয়। উক্ত সুফল দান উপলক্ষে আটিকা বন্ধন বা আটিকা বন্দোবস্ত করা হয়। আটিকার অর্থ হাঁড়ী, একটী ব্রাহ্মণের ৬ মাসের খোরাকিকে প্রায় একপোয়া আটিকা বলে। এক বৎসরের অদ্ধ আটিকা, দুই বৎসরের পূর্ণ আটিকা বলে। পূর্ব্বে একপোয়া আটিকার মূল্য ২৫৲ টাকা ছিল, আজকাল ৩৭৲ টাকা হইয়াছে।

সমস্ত তীর্থ কার্য্যের পর সুফল দানের সময় স্বীয় স্বীয় পাণ্ডা এই আটিকা দানের যাঞ্চা করিয়া থাকেন। এবং যাত্রীগণ আপনার সাধ্যমত দান করেন, বা ঐস্থানে বসিয়া অঙ্গীকার করিয়া

াকেন। শ্রীবৃন্দাবনে ও বদ্রীনারায়ণেও এইরূপ সুফল দানের প্রথা আছে।

পাতালেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া আনন্দ বাজারে যাইতে হয়, এখানে অন্ন ব্যঞ্জন মহাপ্রসাদ বিক্রয় হইয়া থাকে। তাহারপর স্নান মণ্ডপ দর্শন করিয়া পুনরায় দেউড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়, এখানে শুষ্ক মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয় শুষ্ক মহাপ্রসাদ যথা :—জগন্নাথ বল্লভ, মগজনাড়ু, খাজা, পারিজাত, মালপুয়া, নানাবিধ পিষ্টক, দাঁত ভাঙ্গা ইত্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে। কোন কোন যাত্রী এখান হইতে ঠাকুরের রান্না বাড়ী দেখিতে যায়। রান্না বাড়ীর বিশেষত্ব এই যে বড় চুল্লীতে ৬।৭ টা ফোকর আছে, প্রত্যেক ফোকরে লম্বা লম্বা বড় বড় হাঁড়ি বসে এবং আবশ্যক হইলে হাড়ির উপর হাঁড়ি বসে, এই প্রকার বিস্তর চুল্লী আছে, নতুবা সহস্র সহস্র যাত্রীগণের ও মঠবাসী ভক্তবৃন্দের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রসাদ সেবার সংস্থানের উপায়ান্তর নাই, রথযাত্রা হইতে পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীগুণ্ডিচা বাড়ীতে এইরূপ ব্যবস্থা বন্দোবস্ত আছে, ও হয়।

এ তীর্থে কোথায় কিরূপ ভোগাদি দিতে হয় ইহা সম্পূর্ণ যাত্রীগণের মানস ও ক্ষমতা সাপেক্ষ। যাঁহার যেখানে ইচ্ছা ভোগাদি দিয়া থাকেন। তবে সকল মন্দিরে একটী করিয়া দীপ ও প্রণামী দিয়া থাকেন। জগন্নাথের মন্দিরের উপরে বা পদতলে দীপ দান করা হয়। বিরাট মন্দিরের বিরাট পূজার এই ব্যবস্থা।

এক সময়ে এ স্থানে আসার অতি দুর্গম পথ ছিল বটে, কিন্তু এত কষ্টে ভক্তিভাব বেশী উদয় হইত। এখন বাষ্পীয় শকটে পুরী হইতে ৫ মাইল দূরস্থিত মালতী পাঠপুর হইতে যখন

শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখা যায় তখন মনে কতকটা ভক্তিতে গদগদ ভাবের উদয় হয়।

প্রার্থনা।

পতিত জনেরে করিয়ে উদ্ধার,
পতিত পাবন নামটী তোমার।
তাই শুনে নাথ এসেছি ছুটিয়া,
সব শোক তাপ যাইবে মুছিয়া।
মুরতি তোমার নয়নাভিরাম,
নয়ন পথগামী হও অবিরাম।
আহা কি সুন্দর মন মুগ্ধকর,
বিমোহিত প্রাণ হতেছে আমার।
আনন্দ ধামেতে ত্রিমূর্ত্তি রূপেতে,
বসি দয়াময় ও রত্ন বেদীতে।
বিরাজিছ নাথ প্রেমের মুরতি,
প্রেম পরকাশি জগতের পতি!
ভেদাভেদ জ্ঞান করি তিরোধান,
জগন্নাথ রূপে হলে অধিষ্ঠান।
পাপী, তাপী, সবে আসিতেছে ছুটে,
ভ্রমরার মত পড়িবে হে লুটে।
চরণ কমলে মধু করি পান
জুড়াইবে আহা তৃষিত পরাণ।
বিশাল রূপেতে আমিত্ব ভুলায়ে,
দাও হে তোমার চরণে মিশায়ে।

কণ্ডেয়, নরেন্দ্র সরোবর, শ্বেত গঙ্গা, স্বর্গদ্বার অথবা চক্রতীর্থ, রোহিণী কুণ্ড, এই পাঁচটাকে পঞ্চতীর্থ বলে। চক্রতীর্থটা পুষ্করিণী নহে, সমুদ্রের সহিত একটি ছোট নদীর সঙ্গমস্থল।

পঞ্চশিব— মার্কণ্ডেয়, কপালমোচন, যমেশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, ও প্রায় দেড় মাইল দূরে লোকনাথ।

পুরুষোত্তমে অনেক সাধুদের মঠ আছে যথা পুরের বা সিংহ-দ্বারস্থিত ঝমার মঠ, দক্ষিণ পার্শ্ব মঠ, উত্তর পার্শ্ব মঠ, শঙ্করাচার্য্যের মঠ, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর মঠ, পাগল হরনাথের মঠ মুলুকদাস, হরিদাস, গুরু নানকের মঠ ইত্যাদি।

প্রথম জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইবার সময় প্রসাদ খাইয়া দর্শন করিতে যাইতে হয়।

জগন্নাথ দেবের বাহান্ন ভোগ হয়। ভোগের পর সেই প্রসাদ আনন্দ বাজারে বিক্রয়ার্থ যায়। অনেকে মন্দির হইতে কিনিয়া লয়। আমাদের মন্দির হইতে কিনিয়া লওয়া হইত। ছত্রবাড়ীর ভোগ ও মঠ ভোগ, রাজবাড়ীতে ও মঠাদিতে পাওয়া যায়।

বিতরের বাড়ী ও মাসীর বাড়ী আছে।

জগন্নাথে সকল বর্ণাশ্রমের মিলন হইয়া শান্তি স্থাপন হইয়াছে এখানে জাতিভেদ নাই, সকলেই আনন্দসহকারে প্রসাদ আনন্দ ভোগ করিতেছে।

পুরীতীর্থে সমুদ্রের শোভা সন্দর্শন করিলে চিত্ত বিমোহিত হয়। সমুদ্র ছাড়িয়া আর কোথাও যাইবার ইচ্ছা হয়না। মনে হয়,

জগন্নাথ বুঝি সসীম ও অসীমের মিলন স্থল এই খানেই বিশাল বিরাট রূপে প্রকটীত রহিয়াছেন।

অসীম সমুদ্রের কুলে এই বিরাট বিশ্বরূপ মূর্ত্তি দর্শনে মন আত্মহারা হইয়া অসীম সমুদ্রেই লীন্ হয়।

সমুদ্রের উর্ম্মিমালা সকল ছুটিয়া আসিয়া যেন বিশ্বময় জগন্নাথের চরণে লুটাইয়া চরণ ধোত করিতেছে।

বাস্তবিক শুনিতে পাওয়া যায় যে দেব কবি তাঁহার একটা চরণ পূরণ উপলক্ষে সমুদ্রের জলে ভগব করিয়াছিলেন, বলিতে গেলে সাগরের অনন্তত্ব বা অসীমত্ব তাঁহারই অনন্তত্ব ও অসীমত্ব প্রকটিত করিতেছে।

কি নিধি মিলিল।

অসীম সমুদ্রে আজি কি নিধি মি !
প্রাণ আকুল কোরে, মন হারাইঃ
অন্তরে বাহিরে তোমা কতযে খুঁজেছি,
কতবার কতরূপে তোমারে দেখেছি।
আজি একি বিশ্বরূপ নয়নে ভাসিছে।
দেহ ছাড়ি প্রাণে যেন "প্রাণায়ামে" মিশেছে।
অনন্ত জলধি তুমি অনন্তে মিশিয়া।
অনন্ত বিশ্বের রূপ দিলে দেখাইয়া।

ভুবনেশ্বর।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিয়া, সাক্ষী গোপাল ও ভুবনেশ্বর দর্শন। ভুবনেশ্বরে জগন্নাথের মত সমস্তই, ভোগ রান্না বাড়ী. গুণ্ডিচা বাড়ী। যাত্রীরা সকলে প্রসাদ পায়। বড় বড় ধর্ম্মশালা আছে, ধর্ম্মশালার ভিতরেই পুষ্করিণী, বাগান। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজার দিন ভুবনেশ্বরে রথ টানা হয়। সে সময় ভুবনেশ্বরে খুব মেলা হয়, অনেক যাত্রী আসে।

গুণ্ডিচা বাড়ীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রম আছে। ভুবনেশ্বরে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক লোক আসেন।

ভুবনেশ্বর হইতে গরুর গাড়িতে করিয়া উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, দর্শন করিতে যাইতে হয়।

উদয়গিরি পাহাড়ে সূর্য্যদেবের উদয়ের সময় দেখিতে অতি সুন্দর। উদয় গিরিতে অনেক গুলি গুহা আছে, সেখানে সন্ন্যাসীদের সাধনার স্থান। জয়া বিজয়া, রাণী, গনেশ, স্বর্গ মর্ত্ত হস্তী, সর্প, ব্যাঘ্র, হরিদাস, জগন্নাথ এই কয়টী গুহা।

উদয় গিরির পাশে খণ্ড গিরি সেখানেও অনেক গুলি গুহা আছে। অনন্ত, দেবসভ্য, পরেশনাথের মন্দির, আকাশ গঙ্গা, দুর্গা, মহাবীর, নব মুনি ও ধ্যান গুহা।

উদয়গিরি, খণ্ডগিরি দর্শন করিয়া সেই দিনই ভুবনেশ্বরে ফিরিয়া আসিলাম।

বৈদ্যনাথ।

বৈদ্যনাথে যাইবার সময় জসীডীতে গাড়ী বদল করিতে হয়। জসীডী হইতেই পাণ্ডারা যাত্রীগণকে লইবার জন্য আসে। পাণ্ডাদের বাড়ীতে অনেক যাত্রী থাকে। আর ধর্ম্মশালাও আছে।

কর্ম্মনাশা নদীর পারে বৈদ্যনাথ ধাম বৃহৎ মন্দিরের ভিতর বৈদ্যনাথের মূর্ত্তি আছেন।

মাঘ ফাল্গুন মাসে অনেক দেশ দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র লোক গঙ্গাজল লইয়া আসে বৈদ্যনাথের মাথায় দিবার জন্য। বৈদ্যনাথ শিবের মাথায় গঙ্গাজল দেওয়া বিশেষ পুণ্যকার্য্য।

মন্দিরের মধ্যে অনেক দেব দেবীর মন্দির আছে।

মন্দিরের উত্তরে শিবগঙ্গা নামে একটা বড় সরোবর আছে। সেই সরোবরে পাথর বাঁধান ঘাট ও মন্দির আছে, যাত্রীরা ঐ সরোবরে স্নান করিয়া থাকেন।

বৈদ্যনাথ শিবের কোনরূপ ভোগের বন্দোবস্ত নাই, শুনিয়াছি দধি চিড়ার ভোগ হয়।

যাত্রীরা যাহারা যেরূপ মানসিক করে তাহারা সেইরূপ পূজা দিয়া থাকেন।

বৈদ্যনাথে অনেক নর নারী ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ধর্ণা দিয়া থাকেন।

নন্দন পাহাড় ও ছোট ছোট অনেক পাহাড় আছে, বৈদ্যনাথের কিছু দূরে তপোবন আছে।

বৈদ্যনাথে অনেক লোক হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে যায়।

বিন্ধ্যাচল।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশে আমার তীর্থ ভ্রমণ। আমি জানিতাম শ্রীগুরুদেব যখন বুঝিয়া লইয়া দিবেন সেই সময় তাঁর কৃপায় তীর্থ দর্শন হইবে। সেই জন্য আমি কখনও চেষ্টা করি নাই। সেই শ্রীমুখের বাণী সময়েই পূর্ণ হইবে।

যখন তীর্থ দর্শনের সময় হইবে, সেই সময় শ্রীগুরুর কৃপায় সমস্ত যোগাযোগ হইবে।

আমার চাঁনদিদি (বাবার মাসীমা) কাকাবাবু, পিসিমা প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমনে যাত্রা করিয়া প্রথমে গয়ায় আসিলেন। তাঁহারা গয়ার কার্য্য শেষ করিয়া অন্যান্য তীর্থে যাইবেন।

শ্রীগুরু পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আমিও তাঁদের সঙ্গে তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিলাম। মনে করিলাম এ তাঁহারই প্রেরণ।

আমরা সন্ধ্যা ৬টায় ট্রেনে রওনা হইয়া ভোর ৪টার সময় গঙ্গাকূলে বিন্ধ্যাচলে পৌঁছিলাম। আমরা গঙ্গাস্নান করিয়া, বিন্ধ্যাগিরির একাংশে পাহাড়ের উপর বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর প্রাচীন মন্দির আছে, ভগবতী এখানকার প্রধানা দেবী, যখন চণ্ড ও মুণ্ডের সহিত কালী ও কৌশিকীর যুদ্ধ হয়, সেই সময় চামুণ্ডা নামে এই দেবী আবির্ভূতা হন। অষ্টভুজা দেবী আছেন। বিন্ধ্যেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের কাছে হনুমানের মূর্ত্তি আছে সেইখানে পাণ্ডারা যাত্রীদের সুফল দেয়।

আমরা দর্শনাদি করিয়া সেইদিনই ১১টার ট্রেনে এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম।

এলাহাবাদ বা প্রয়াগ।

আমরা এলাহাবাদে আসিয়া আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিলাম।

পরদিন সকালে সকলে কেল্লার ভিতর গিয়া সমস্ত দেবদেবী অক্ষয়বট দেখিয়া নৌকা করিয়া সঙ্গমে স্নান করিলাম। এইখানে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মিলন হইয়া ত্রিবেণী হইয়াছে। সোমনাথ আলোপী দেবী দেখিয়া ঝুঁশিতে গেলাম, ঝুঁশির পাহাড় বড় মনোহর নির্জ্জন স্থান। এই স্থানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীরা থাকেন ইহা তপস্যার স্থান।

দারাগঞ্জে বেণীমাধব, ব্রহ্মেশ্বর, শূলটঙ্কেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করা হইল।

এলাহাবাদে কুম্ভের মেলাতে খুব লোকের ভীড় হয়, অনেক নাগা সন্ন্যাসীরা আসেন। কুম্ভ যোগের সময় আগে নাগা সন্ন্যাসীদের, সাধুদের স্নান হইলে তাহার পর অন্য লোকেরা স্নান করিবে। কুম্ভ যোগের স্নানের সময় নাগা সন্ন্যাসীরা সকলে হাতী, ঘোড়া, উট, পাল্কী করিয়া আর কত নাগারা পদব্রজে আসেন। সে সময়ের দৃশ্য বড়ই মনোরম। সাধু দর্শনের জন্য সে সময় রাস্তায় ভয়ানক ভীড় হয়। যমুনার এপারে ওপারে এত লোকের ভীড় হয় কিছুমাত্র স্থান থাকেনা। একস্থানে এত ভীড় সাধুসঙ্গ বড়ই আনন্দময়।

সেবাসমিতি হইতে অনেক ভলেন্টিয়ার যাত্রীদের অনেক সাহায্য করেন। যদি কোন লোক ভীড়ে হারাইয়া যায়,

ভলন্টিয়ারগণ সেবাসমিতিতে রাখিয়া, তাহার আত্মীয়গণের অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

এলাহাবাদের সমস্ত দেখিয়া আমরা আজমীড় যাত্রা করিলাম।

আজমীড়।

আজমীড়ে নামিয়া পুষ্করে যাইতে হয়। আজমীড় হইতে পুষ্কর ৭ মাইল রাস্তা, ঘোড়ার গাড়ী টাঙ্গা করিয়া পুষ্কর যাইতে হয়।

আজমীড় ষ্টেশনে নামিয়া আমরা খাজা সাহেবের কবর দেখিয়া, পুষ্কর যাত্রা করিলাম।

খাজা সাহেবের কবর সমস্ত হিন্দু মুসলমান সকলকে দর্শন করিতে হয়।

পুষ্কর।

পুষ্করে বাঁধান ঘাট, ঘাটের চারিধারে বড় বড় বাড়ী আছে। আমরা ঘাটের ধারে একটা বড় বাড়ী লইয়াছিলাম।

পুষ্করে—গৌঘাট, ব্রহ্মঘাট, কপালমোচনঘাট, যজ্ঞঘাট, দর্শবারী-ঘাট, রামঘাট, কোটিতীর্থঘাট আছে, অনেক ঘাটের ধারে কতকগুলি দেবদেবীর মন্দির আছে—ব্রহ্মার মন্দিরে ব্রহ্মা মূর্ত্তি আছেন। ইঁহার বাম পার্শ্বে গায়ত্রীর মূর্ত্তি ও দক্ষিণ পার্শ্বে সাবিত্রীর মূর্ত্তি আছে। ইঁহার চারিধারে সনকাদি চারিভ্রাতার মূর্ত্তি আছে। একটী ছোট মন্দিরে নারদের মূর্ত্তি আছে। অন্য আর একটী ছোট মন্দিরে ইন্দ্র ও কুবের মহারাজের মূর্ত্তি আছে। বদ্রীনারায়ণের, বরাহজীর ইত্যাদি অনেক মন্দির আছে।

পাহাড়ের উপরে সাবিত্রী দেবী অধিষ্ঠিত। পাহাড়ের ৩৬০টী সিঁড়ি আছে। ডুলি পাওয়া যায়, যাঁহারা পদব্রজে উঠিতে না পারেন, তাঁহারা ডুলি করিয়া থাকেন। আমরা ছয় খানা ডুলি করিয়াছিলাম, ডুলি ভাড়া ১৲ টাকা করিয়া লাগে।

পুষ্করে লোহা, সিঁদুর বিক্রয় হয়। সাবিত্রীর কপালে সিঁদুর ও হাতে লোহা দিতে হয়। আর সেই প্রসাদী লোহা ও সিঁদুর আনিয়া আত্মীয়গণকে দিতে হয়।

আমরা সাত দিন পুষ্করে ছিলাম। পুষ্কর স্থানটী বড়ই নিজ্জন ও শান্তিময়।

পুষ্করিণীতে অনেক কচ্ছপ আছে। কচ্ছপগুলি তীরে উঠিয়া খেলা করে। তাহাদের কোন ভয় নাই, কারণ এখানে জীব হিংসা নিষেধ।

স্নানের সময় সাবধানে পুষ্করিণীতে স্নান করিতে হয়। কারণ জলজন্তুর বিশেষ ভয় আছে।

কুরুক্ষেত্র।

কুরুক্ষেত্রে আমরা সকলে আসিয়া পৌঁছিলাম। ধর্ম্মশালায় থাকিয়া সকলে দ্বৈপায়ণ হ্রদে স্নান করিয়া কুন্তী যে মহাদেবকে সহস্র স্বর্ণ চাঁপা দিয়া পূজা করিয়াছিলেন, সেই কুন্তীশ্বর দর্শন ও পূজা করিয়া, অভিমন্যু, কর্ণ, দ্রোণ, প্রভৃতির মৃত্যুস্থান ও পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি, থানেশ্বর মহাদেব ভদ্রকালী, ভীষ্মের শরশয্যা, অর্জ্জুনের বানগঙ্গা, সরস্বতী ইত্যাদি দর্শন করিলাম।

এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণদেব সখা অর্জ্জুনকে শ্রীগীতার উপদেশ দিয়াছিলেন। সেইজন্য এই পূণ্যভূমি সকলের দর্শন করা উচিৎ।

সূর্য্যগ্রহণে এইখানে স্নান করায় বিশেষ মাহাত্ম্য আছে।

সেইদিন রাত্রেই আমরা কুরুক্ষেত্র হইতে জয়পুর যাত্রা করিলাম।

জয়পুর।

আমরা সকলে জয়পুরে পৌঁছিলাম। এখানকার রাজার গোবিন্দজীউ, গোপীনাথ, গোকুলনাথ, রাধা দামোদর, রামচন্দ্র, বিশ্বেশ্বর শিব প্রভৃতি দেব মন্দির দর্শন করিয়া, তাহারপর জয়পুর চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম দেখিয়া পরদিন সকলে মথুরা যাত্রা করিলাম।

মথুরা।

মথুরায় আমরা চার দিন থাকিয়া বিশ্রাম ঘাট, ধ্রুবঘাট যোগঘাট, প্রয়াগঘাট, কংসঘাট, ইত্যাদি স্থানে স্নান ও দর্শনাদি করিলাম।

গোপীনাথজীউর মন্দির, মথুরানাথের মন্দির, দাউজীর মন্দির, মদনমোহন মন্দির, বিজয় গোবিন্দের মন্দির, দ্বারকাধীশ মন্দির রাধাকৃষ্ণের মন্দির আরও অনেক মন্দির আছে। কংসের কারাগার আছে। মথুরায় অনেক দেখিবার জিনিষ আছে।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরা, বৃন্দাবনে কত লীলা করিয়াছিলেন। সেই লীলাভূমির স্মৃতি চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

বিশ্রামঘাটের আরতি দেখিতে বড়ই সুন্দর যতক্ষণ আরতি হয়, নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না।

বিশ্রামঘাটের নিকট একটী স্তম্ভ আছে, তাহাকে সতী স্তম্ভ বলে। শ্রীকৃষ্ণ কংস বধ করিয়াছিলেন, সেই সময় রাণীরা এইস্থানে চিতারোহণ করিয়াছিলেন।

মথুরায় সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়া আমরা মথুরা হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া বৃন্দাবনে আসিলাম।

বৃন্দাবন।

বৃন্দাবনে অনেক দেখিবার জিনিষ আছে। আমরা যে দিন বৃন্দাবনে আসিলাম, সেইদিন পাণ্ডা বলিল "বৃন্দাবনে ছয় স্থানে ভেট দিতে হয়। গোবিন্দজী, গোপীনাথ, বঙ্কুবিহারী, যমুনা বৃন্দা, গুরুপাট এই ছয় স্থানে ভেট। প্রত্যেক স্থানে ৫৲ টাকা করিয়া ভেট দিতে হয়।"

৫৲ টাকা করিয়া ভেট শুনিয়া আমি বলিলাম "আমার বোধ হয় গোবিন্দজীর মন্দিরে গিয়া দর্শন হইবেনা। কারণ আমার মত লোক ৩০৲ টাকা ভেট দিয়া দেব দর্শন করা অসাধ্য"। পাণ্ডা বলিল ইহার কমে হইবেনা।

তখন মনে হইল দয়াময় তোমার একি লীলা! অর্থ না দিলে তোমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিব না? যাদের অর্থ আছে তারাই তোমার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দর্শন পূজা করিবে? আর যারা ভিক্ষারিণী তাদের তোমার মন্দির প্রবেশের অধিকার নাই? হে দয়াময়! তুমি যে কাঙ্গালের ঠাকুর, তুমি দয়া করিয়া আমার

সদয় মন্দিরে আসিয়া দেখা দাও। এখানে অর্থের পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধা-ভক্তি চাই। হে দেব! তুমি দয়া করিয়া এই কাঙ্গালিনীকে শ্রদ্ধা-ভক্তি দাও। দয়াময় তুমি না দিলে আমি কোথায় পাব।

পরদিন সকালে সকলে দর্শন করিতে যাইবেন, আমাকেও যাইতে বলিলেন।

যিনি আমাকে তীর্থ ভ্রমণে আনিয়াছেন এ দীন আবেদনে আমার তীর্থ ভ্রমণ সেই করুণাময় গুরুদেবের পাদ পদ্ম স্মরণ করিয়া আমিও তাঁহাদের সঙ্গে গেলাম

প্রথমেই গোবিন্দজীর মন্দিরে যাওয়া হইল। ঠাকুরের অপার মহিমা যেমন যে মন্দিরের দ্বার অবারিত খোলা। কেহই মন্দিরে যাইতে নিষেধ করিল না, বা ভেটের নাম উল্লেখ করিল না। পূজারীরা কত যত্ন করিয়া মন্দিরের মধ্যে লইয়া গিয়া দর্শন করাইলেন।

ঠাকুরের অপার করুণা দেখিয়া আমার আনন্দে অশ্রুজল বহিতে লাগিল।

ধন্য তুমি দয়াময় ধন্য তোমার কৃপা, সকলই তুমি কাঙ্গালের ঠাকুর। কাঙ্গালিনীকে কতবার কতরকমে পরীক্ষা করিয়াছ। আজ তোমার একি অদ্ভুত লীলা। দয়াময় তোমার কত শত দাস-দাসী তোমার চরণ সেবার অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু আমি সে ভক্তি টুকু সংগ্রহ করিনি বলে বড় ভয়ে ভয়ে তোমার মন্দিরের দুয়ারে এসেছি। যদি মন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারি, তাহলে মন্দিরের বাহিরে বসিয়া তোমার সেই ভুবন ভুলান প্রাণ মাতান,

প্রেমময় মূর্ত্তি সহস্রদলে প্রণবের মধ্যে দয়া করিয়া দেখা দিও, প্রভু !

তুমি যে দয়া করিয়া নিত্যানন্দ রূপে আমার অন্তরের সব নিরানন্দ দূর করিয়াছ, সেই ভরষায় আজ আমার এই প্রার্থনা।

প্রার্থনা।

বৃন্দাবন ধন, রাধিকারমন,
এস এস বংশীধারী,
মঙ্গল রূপেতে এস হৃদয়েতে,
হেরি আমি আঁখি ভরি।
মূরতি তোমার, অঙ্কিত আমার,
রেখেছ হৃদয় পটে,
সে ছবি হেরিয়ে, আপনা ভুলিয়ে,
চরণেতে পড়ি লুটে।
শুনি বংশীধ্বনি, হয়ে পাগলিনী,
সারা বন খুঁজি আমি
কোথা নীলমণি, ডাকে কাঙ্গালিনী
এস হে অন্তর্যামী।
সেরূপ মোহন, অন্তরে লুকান,
কেন তবে মরি ঘুরে,
এ হৃদয়ে বাস, কর শ্রীনিবাস,
সব দুঃখ যাবে দূরে।

যখন গোবিন্দজী দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসি, তখন কেহ ভেটের কথা বলিল না। বঙ্কুবিহারীর মন্দিরে আসিলাম, তখন ভেট চাহিল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম কত ভেট দিতে হয়। একটী ব্রাহ্মণ বলিলেন লাল যাত্রীর ১।০ পাঁচসিকা আর কাঙ্গাল যাত্রীর ।/০ আনা। আমি ।/০ আনা করিয়া ছয় স্থানে ভেট দিলাম।

গুরুপাটে শাক্তদের কালী মূর্ত্তি আছেন। আর বৈষ্ণবদের গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি আছেন।

শেঠজীর মন্দিরে প্রত্যহ দুইবেলা রাধাশ্যাম ভজন হয়, কাঙ্গালিদের পয়সা, চাল, ডাল, আটা, দেওয়া হয়। সোণার তালগাছ আছে।

শ্রীবৃন্দাবনে অনেক দেব মন্দির আছে গোবিন্দজীর, গোপীনাথ মদনমোহন, রাধারমণ রাধাবিনোদ, রাধাদামোদর শ্যামসুন্দর, গোকুলানন্দ, পৌর্ণমাসী, সাহাজীর, লালাজীর, ব্রহ্মচারীর, গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে।

ব্রহ্মকুণ্ড, যোগপীঠ, অক্রুর তীর্থ, কেশীঘাট, যুগলঘাট, বিহারঘাট, চীরহরণঘাট, শৃঙ্গারঘাট।

নিকুঞ্জবনে রাধাকৃষ্ণের নিত্য বিহারের স্থান নিধুবনে রাধিকা রাজা সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারী করিয়াছিলেন। এই স্থানে তমাল বৃক্ষের গায়ে শ্রীকৃষ্ণ যশোদার ভয়ে মাখনের হাত মুছিয়াছিলেন। পাণ্ডারা সেই দাগ এখনও যাত্রীদের দেখান।

কুঞ্জবন, বেলবন, তমালবন, বৃন্দাবনে চৌষট্টি বন আছে। মিলনের সময় ভিন্ন চৌষট্টি বন ভ্রমণ হয় না।

বংশীবটে, রূপার বংশী আছে, সেই বংশী যাত্রীরা কিনি শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া থাকেন।

কদমতলা, কালীয় - দমন। আর কিছুদূরে রাধাকুণ্ড গিরিগোবৰ্দ্ধন আছে।

ছোট বালকেরা গান করে শুনিতে বড় ভাল লাগে।

রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরিগোবৰ্দ্ধন,
মধুর মধুর বংশী বাজে এইত বৃন্দাবন।
আর করিতে, পার করিতে, নিব আনা আনা,
শ্রীমতীরে পার করিতে নিব কানে সোনা।

স্থানে স্থানে ছোট ছোট বালকদের লইয়া কৃষ্ণলীলা ক[illegible] ঠিক যাত্রার মত ননীচুরী ইত্যাদি দেখিতে খুব সুন্দর।

গোকুলে নন্দরাজার বাড়ী। যশোদার আঁতুড় ঘর, [illegible] দোলা প্রভৃতি আছে।

বৃন্দাবনের যে কত লীলা তাহা সব বর্ণনা করা যায় না।

অযোধ্যা।

আগরা, দিল্লী, লক্ষ্মৌ হইয়া অযোধ্যায় আসিলাম। অযোধ্যায় সরযূ নদীতে স্নান করিয়া রামঘাট, লক্ষ্মণঘাট, রামকোট, রামচন্দ্রের জন্মস্থান, অশ্বমেধ যজ্ঞভূমি ইত্যাদি দেখিবার যোগ্য স্থান ও অতি রমণীয় স্থান।

মণিপৰ্ব্বত, কুবেরের পর্ব্বত, সুগ্রীব পর্ব্বত, হনুমান গড়ী ইত্যাদি আছে।

ষ্টেশন হইতে অযোধ্যা সহর আড়াই মাইল দূরে।
টী পাওয়া যায়।

পরদিন সকালে অযোধ্যা হইতে ৺ কাশীধাম যাত্রা করিলাম।

কাশীধাম।

কাশীতে যে দিন আসিলাম। সেই দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া বিশ্বনাথের গলিতে যাইতে পথে শনিদেব, ঢুণ্ডি গনেশ দর্শন হইল। তাহারপর বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, জ্ঞানবাপী প্রভৃতি দর্শন পূজা করিয়া, সন্ধ্যার সময় কেদার নাথ দর্শন করিয়া আরতি দেখিয়া তারপর বিশ্বনাথের আরতি দেখা হইল।

পরদিন মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া শঙ্কটা, শঙ্কর, [illegible] দুর্গাবাড়ী, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম দেখিলাম।

রামনগরে রাজার বাড়ী ও রাজার দুর্গা বাড়ী, সোনার দুর্গা মূর্ত্তি আছেন। মন্দিরটী খুব সুন্দর।

তাহার পরদিন অসী হইতে বরুণা পর্য্যন্ত পঞ্চ গঙ্গায় স্নান হইল।

ব্যাস কাশী দেখিয়া, সারনাথে যাওয়া হইল, সারনাথে বুদ্ধদেবের বহুদিনের পুরাতন জিনিষ। মাটী খুঁড়িয়া বাহির করিয়া সেই সমস্ত জিনিষ একটী বাড়ীতে মিউজীয়মের মত রাখা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে। আর সারনাথ মহাদেব আছেন।

বেণীমাধব ও বেণীমাধবের ধ্বজা দেখিলাম. ধ্বজার উপর উঠিলে কাশী সহর সমস্ত দেখা যায়। বেণীমাধবে তৈলঙ্গ স্বামীর মূর্ত্তি আছে। আনন্দবাগে ৺ ভাস্করানন্দস্বামীর মার্ব্বেল পাথরের সমাধি

মন্দির আছে। বাল্যকালে একবার এই আনন্দ বাগে গিয়াছিলাম, তখন ভাস্করানন্দ স্বামী ছিল। সে সময় এই আনন্দ বাগ কত আনন্দময় ছিল। এখন সেই আনন্দ বাগ নিরানন্দময় হইয়াছে।

শিবময় কাশী। তিলভাণ্ডেশ্বর, পুষ্পদণ্ডেশ্বর, শূলটঙ্কেশ্বর, শিবের কাছারী বাড়ী, কালভৈরব ইত্যাদি অসংখ্য মন্দির আছে। একদিনে সকল শিবের মাথায় জল দেওয়া অসম্ভব।

বিশালাক্ষী, কামাখ্যাদেবী, চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির, শীতলা মাতার মন্দির আছে।

কাশীতে এক বৎসর থাকিলেও সমস্ত দেব-দেবীর মন্দির দর্শন শেষ হইবেনা।

অন্নকূটের সময় অন্নপূর্ণার মন্দির দেখিতে বড়ই সুন্দর সেই সময় সোনার অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি দর্শন হয়। অন্নপূর্ণার মন্দির অন্নব্যঞ্জনে পরিপূর্ণ হয়। পর্ব্বত পরিমানে সমস্ত রকম মিষ্টান্ন সাজান হয়।

পাণ্ডাদের ।০ আনা দিলে অন্নপূর্ণার আসল মূর্ত্তি দর্শন করান।

শোক সন্তপ্ত প্রাণ জুড়াইবার স্থান কাশী। প্রত্যেক স্থানে স্থানে ভাগবৎ, দেবী ভাগবৎ, কাশীখণ্ড পাঠ হইতেছে। ভোর ৪টার সময় হইতে জয় বিশ্বনাথ ধ্বনিতে কাশীবাসীগণকে জাগরিত করিতেছে।

গঙ্গার ধারে বসিলে প্রাণে কত শান্তি পাওয়া যায়। সন্ধ্যার দীপমালায় গঙ্গা কত শোভাময়ী হন।

অসংখ্য নর-নারী মোক্ষলাভ করিবার আশায় বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণার চরণ তলে পড়িয়া কত শান্তি উপভোগ করিতেছেন।

মা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ আছে। কাশীর দোকান বাজার দেখিলে মনে হয় সত্যই মা অন্নপূর্ণা সোনার কাশী রচনা করিয়াছেন।

অন্নপূর্ণা রূপে আসি সাজালে সোনার কাশী
এসেছেন বিশ্বনাথ ভিখারীর বেশে,
ওমা মন্দিরে তোমার, তুমি ফিরাওনা আর,
লীলাময়ী কত লীলা, ছাড়িয়ে কৈলাসে।
রচিলে মা, কাশীধাম পূরাতে সবার কাম,
সৃজিয়াছ মাগো, কাশী আনন্দ ভবন।
কত নর-নারী আসি, ভজিছে তব কাশী,
মোক্ষ অভিলাষে তব লয়েছে শরণ।
পূজি যুগল মূরতি, লভে শান্তি মুক্তি গতি,
অন্তে মণিকর্ণিকাতে লভে নির্বাণ
ধন্য মা যে ধন্য কাশী, ধন্য হ'ল কাশীবাসী,
চরণ দিয়ে মোরে পূরাও মনস্কাম।

গয়াক্ষেত্র।

বিষ্ণুপাদ মন্দির।

ভক্ত গয়াসুরের মৃত্যু সময়ে, ভগবান গয়াসুরকে বর চাহিতে দিলেন। গয়াসুর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বর চাহিলেন "ভগবান যে স্থানে আমার মৃত্যু হইবে সেই স্থানেই যেন আমি শিলা হইয়া থাকি। হে ভক্তবৎসল, সেই শিলার উপর যেন তোমার শ্রীচরণ

স্থাপিত হয়। আর যে পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকা মণ্ডল বিদ্যমান থাকিবে সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমার এই শিলা শরীরে অধিষ্ঠান করুন। আর যে কেহ এই স্থানে পিণ্ডদান ও তর্পণ করিবে, তাহার পিতৃ পুরুষগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে বাস করিবে। যে দিন ইহার বিপরীত হইবে সেই দিন এই ক্ষেত্র এবং শিলার নাশ হইবে। প্রভো! এই ক্ষেত্রের নাম গয়া-ক্ষেত্র হইবে"।

"তথাস্তু বলিয়া ভগবান বিষ্ণু নিজের পাদ-পদ্ম গয়াসুরের মস্তকে স্থাপন করিলেন, দেখিতে দেখিতে অসুরের শরীর শিলাতে পরিণত হইল।

সেই সময় সমস্ত তীর্থ ও সমস্ত দেব দেবী ৫১ পীঠ ও উপপীঠ গয়াক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন।

বিষ্ণু মন্দিরের প্রবেশের পথে দক্ষিণ দিকে উপপীঠের দেবী গয়েশ্বরী অধিষ্ঠিতা হইলেন।

বিষ্ণু ভগবানের মন্দির রাণী অহল্যাবাই ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মান করাইয়াছিলেন। মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিবার উপযুক্ত এরূপ পাথরের এত বড় মন্দির কোথাও নাই। এই মন্দিরের নাট্য মন্দির খুব প্রশস্ত ও বিচিত্র। অগ্রে শ্রীবিষ্ণুর চরণ চিহ্নটী সুরক্ষিত করিয়া তাহার পর মন্দির নির্ম্মান করা হইয়াছে।

এই মন্দির ফল্গু ও মধুশ্রবা নদীর ধারে অবস্থিত।

পূর্ব্বদিকের সদর দরজার সম্মুখে শ্রীহনুমানজীর বিশাল মূর্ত্তি আছে।

গদাধরের মন্দিরের সম্মুখে নদীর উপর শঙ্করাচার্য্যের নূতন হ নির্ম্মাণ হইয়াছে।

গয়ালীরা এখানকার পাণ্ডা। এখানে অনেক বাঙ্গালী রোহিত আছেন। হিন্দুস্থানী ও মহারাষ্ট্রীয় আচার্য্য ও আছেন।

পিতৃপক্ষের ১৫ দিন খুব যাত্রীর ভীড় হয়। সকল তীর্থ াত্রীরই (খাপ্‌রেল করুন আর নাই করুন) অগ্রে প্রেত শিলায় িণ্ডদান বিধি আছে। অপঘাতে বা আত্মহত্যায় যাহাদের মৃত্যু ইয়াছে, তাহাদের প্রেত শিলায় পিণ্ডদান না দিলে বিষ্ণু পাদ-পদ্মে িণ্ডদান দেওয়া হইবেনা। পূর্ব্বে লোকেরা ৪৫ দিন ধরিয়া াপ্‌রেল করিতেন আবার কাহারাও বা ১৫ দিনে সারিতেন। ন্তু আজ কাল যাত্রীরা এক দিন কিম্বা তিন দিনে গয়ার শ্রাদ্ধ াষ করেন। তাহাদের "খাপ্‌রেল" করা হয় না।

বিষ্ণু মন্দিরের সম্মুখে ফল্গু নদীর পরপারে সীতাকুণ্ড ও মগিরি আছে। এখানে সীতাদেবী দশরথকে বালীর পিণ্ডদান রিয়াছিলেন। দশরথের হাত আছে। আর সীতা দেবীর র্ত্তি আছে। ফল্গু, তুলসী, বট বৃক্ষকে সাক্ষী করিয়া পিণ্ডদান রিয়াছিলেন। ফল্গু মিথ্যা বলিয়াছিলেন, সেইজন্য সীতা অন্তঃসলিলা হও" বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন। বট বৃক্ষ সত্য লিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে "অক্ষয় হও" বর দিয়াছিলেন।

বিষ্ণু মন্দিরের উত্তর পশ্চিমে সূর্য্যকুণ্ড নামে একটী বড় করিণী আছে। ইহার দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ মানস, মধ্যে কনখল ং উত্তর ভাগে উকচী কুণ্ডের সম্মুখে সূর্য্যদেবের মন্দির

সূর্য্যদেবের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি আছে। এই স্থানে চৈত্র ও কার্ত্তিক মাসে শুক্লা অষ্টমীর দিন ও ষটপঞ্চমী ব্রতে খুব মেলা হয়।

বিষ্ণু মন্দিরের এবং ব্রহ্মযোনির মাঝামাঝি স্থানে অক্ষয়বট বিরাজমান। ইহার নিকটেই রুক্মিণী কুণ্ড। এইস্থানে শেষ পিণ্ডদান করিতে হয় এবং এই স্থানেই পাণ্ডারা যাত্রীদের সুফল দিয়া থাকেন, ইহার নিকটে বৃদ্ধ প্রপিতা মহেশ্বরের মন্দির আছে

অক্ষয় বটের কিছু পূর্বে আদি মায়া মঙ্গলা গৌরীর মন্দির প্রায় ১১২টা সিঁড়ি পাহাড়ের উপর দেবীর (৫১ পীটের) পীঠস্থান।

এখানে দেবীর স্তন পড়িয়াছিল সেইজন্য দেবী মঙ্গলা গৌরী কিছু নিকটে মহাদেব মার্কণ্ডদেবের মন্দির আছে। দুর্গা পূজার তিন দিন মঙ্গলা গৌরীতে পূজা, বলি, চণ্ডিপাঠ হয়। মঙ্গলা গৌরীর পাশে জনার্দ্দনের মন্দির আছে। পাহাড়ের নীচে কিছু দূরে লক্ষ্মী সরোবর আছে।

ফল্গু নদীর পর পারে শঙ্কটা দেবীর মন্দির আছে। আর সেই থানে প্রপিতা মহেশ্বর মহাদেব আছেন।

গয়াক্ষেত্র পর্ব্বত মালায় সুশোভিত। সেইজন্য এখানে অনেক সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের ৪২৮ টা সিঁড়ী আছে। পাহাড়ের উপর ব্রহ্মা আছেন

ব্রহ্মযোনির নিকটেই কপিল ধারা সেখানে লেংটা বাবার আশ্রম ও সমাধি মন্দির আছে। আশ্রমটী অতীব মনোরম শান্তিময় স্থান। এই স্থানে আসিলে আর গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। এখানে গম্ভীরনাথ, লেংটা বাবা, কৃষ্ণানন্দ স্বামী আরও অনেক সন্ন্যাসীর সাধনার স্থান।

আকাশগঙ্গা পাহাড়ের উপর বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর ...স্যার স্থান। কুলদানন্দ স্বামী এই স্থানে সাধনা করিয়াছেন।

রামশীলা, দুঃখহারিণী দেবীর স্থান হইতে ১ মাইল দূরে ৩৫৭টী সিঁড়ী আছে। রাম লক্ষ্মণের মন্দির ও পাতালেশ্বর শিব আছেন। নিকটেই বাগেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে।

গোরক্ষণীর সভার গোশালীর নিকট গোরক্ষণী বাবার আশ্রম সমাধি মন্দির আছে।

প্রেতশিলা পাহাড় রামশিলা হইতে ৬ মাইল দূরে। ...হাড়ের নীচে ব্রহ্মকুণ্ড নামে একটী পুষ্করিণী আছে, এই স্থানে ...ন ও তর্পন করিয়া পিণ্ডদান করিতে হয়। প্রেত শিলায় ...পিণ্ডদান করিলে মৃত প্রেতযোনি হইতে উদ্ধার হইয়া যায়। ...খানকার পাণ্ডাকে "স্বামী" বলে। পাহাড়ে উঠিতে ৪০০ সিঁড়ি ...ছে। এখানে একটা ছোট ধর্ম্মশালা আছে।

বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধদেবের মন্দির আছে মন্দিরটী দেখিবার জিনিষ, ...বৃক্ষমূলে বুদ্ধদেবের সমাধি আসন আছে। এই স্থানে বুদ্ধদেব ...মাধি লাভ করিয়াছিলেন। মন্দিরের ভিতর প্রস্তরের উপর ...বার পাত মোড়া বুদ্ধদেবের বিশাল মূর্ত্তি আছে। কত দেশ-...দেশান্তর হইতে কত লোক এই মন্দির দর্শন করিতে আসেন। ...গয়া স্থানটী বড়ই নির্জ্জন ও মনোরম। বুদ্ধদেবের মন্দিরের ...কট পঞ্চ পাণ্ডবের ও জগন্নাথের মন্দির আছে।

বুদ্ধগয়ায় মহন্তজীর বাড়ী, বাগান ইত্যাদি আছে।

যাঁহারা ধাপ্রেত করেন, তাঁহারা বুদ্ধ গয়ায় পিণ্ডদান করেন।

গয়াতে অনেক দেব দেবীর মন্দির আছে। তাহাতে শঙ্কর মাতার ও তাহার সম্মুখে পিতা মহেশ্বরের মন্দির আছে।

ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের উপর আদি গদাধরের মন্দির ও তাহে কামাখ্যা দেবী মূর্ত্তি আছেন।

ফল্গু নদীতে গ্রীষ্মকালে জল থাকেনা। বর্ষাকালে খুব জল হয় শীতকালে একেবারে শুকাইয়া যায়। বালুকা রাশি মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে। নিম্ন বালি খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায়।

স্তব।

জয় জয় গদাধর করুণা সাগর,
কৃপাময় কৃপাকর দাসীরে তোমার।
ভবে ভ্রমি ক্লান্ত হয়ে নিরাশ অন্তরে,
চরণ লভিব বলে এসেছি দুয়ারে।
বঞ্চিতা হব না এই আশা আছে মনে
কাঙ্গালিনী বলে যারে ফিরাল সকল জনে।
কাঙ্গালের সখা তুমি তারে ফিরাবেনা জানি
মাগিতেছি ভিক্ষা তাই চরণ দুখানি।
চরণ পরশে জল, যাইবে ধুইয়া
মনের "মলিন পঙ্ক" দাওহে মুছিয়া।
করুণ আলোক দাও পথ দেখাইয়া
অন্ধের মত যে শুধু রয়েছি বসিয়া।
তাই সকাতরে নাথ ডাকিছে তোমারে
তোমা বিনে মোর কেহ নাহি এ সংসারে।

অনিত্য সংসারে নাথ, চাহি নিত্য ধন
নতুবা জীবনে মম নাহি প্রয়োজন।
তোমার চরণ তলে লভিতে আশ্রয়
আছি আমি আশা কোরে ওহে দয়াময়।
ভবের কাণ্ডারী হয়ে ভব পারাবার
কোরে দিও পার ওহে দাসীরে তোমার।

—০:০—

পশুপতিনাথ।

পশুপতি নাথে যাইবার সময় বী, এন, ডব্লিউ রেল দিয়া রকসৌল হইয়া যাইতে হয়। পূর্বে রকসৌল হইতে পদব্রজে যাইতে হইত। এখন বীরগঞ্জ হইতে একখানি ছোট রেল হইয়াছে তাহা ভীক্ষাগড়ি পর্য্যন্ত যায়। ভীক্ষাগড়ি হইতে কাণ্ডি, মটর ও পদব্রজে যাইতে হয়। মটরে প্রত্যেক লোকের ৮৲ টাকা করিয়া ভীমভেরী পর্য্যন্ত ভাড়া। আর কাণ্ডি ভীক্ষাগড়ি হইতে একেবারে পশুপতি নাথ পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভাড়া। মটরে যাইতে বড়ই কষ্ট চড়াই ও উৎরাই রাস্তা খুব ধাক্কা লাগে। সেইজন্য কাণ্ডিতে কিম্বা পদব্রজে যাওয়াই ভাল।

বীরগঞ্জ হইতে "পাসপোর্ট" লইতে হয়। শিব রাত্রির সময় পশুপতি নাথের মেলা হয়। এই সময় যাত্রীদের যাইবার সময়। অন্য সময় যাত্রীরা যায় না

ভীক্ষাগড়ি পর্য্যন্ত আমরা রেলে গিয়াছিলাম তাহারপর আমার সঙ্গিরা পদব্রজে যাইবেন বলিলেন। কিন্তু সে সময় আমার শরীর অসুস্থ থাকায় আমি পদব্রজে যাইতে সাহস করিলাম না, একখানা

মটর ঠিক করা হইল, তাহাতে ৫।৬ জন ছিলাম। প্রত্যেকে ৮৲ টাকা করিয়া ভাড়া দিয়া ভীমভেরী পর্য্যন্ত যাওয়া হইল। পশুপতি নাথের ডাক্তার বাবু ঐ মটরে ছিলেন। রাত্রি ৯ টার সময় আমরা ভীমভেরীর হাসপাতালে পৌছিলাম। সে রাত্রে আমাদের হাসপাতালেই থাকা হইল।

ডাক্তার বাবু ছিলেন বাঙ্গালী আমাকে খুব যত্ন করিয়াছিলেন। পরদিন সকালে ৬৲ টাকাতে একটা কাণ্ডি ঠিক করা হইল সে একেবারে পশুপতিনাথ পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিবে। ডাক্তার বাবু বলিলেন এ সময় পশুপতিনাথে যাত্রীর খুব ভীড়, যদি আপনি সুবিধা মত ঘর না পান, তাহা হইলে আমার বাসার ঠিকানা দিলাম, আপনি আমার বাসায় গিয়া থাকিবেন, আপনার কোন কষ্ট হইবে না।

দুইদিন কাণ্ডিতে যাইয়া তিন দিনের দিন সকালে পশুপতি নাথে পৌছিলাম। মন্দিরের পাশে একটা ভাল বাড়ী ঠিক করিয়া বাবাকে একবার দর্শন করিয়া আসিলাম। তাহারপর আমার সঙ্গিরা আসিয়া পৌছিলেন।

নেপাল রাজ্যের মধ্যে পশুপতিনাথ নেপাল রাজার ঠাকুর।

পশুপতিনাথের মন্দিরের নিকট যাত্রীদের থাকিবার জন্য অনেক ধর্ম্মশালা আছে। কিছু দূরে গুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে, আরও অনেক দেব মন্দির আছে।

পশুপতিনাথে পাণ্ডা নাই। রাজার পূজারী ব্রাহ্মণ আছে। সেইজন্য পাণ্ডার পীড়ন নাই, পশুপতিনাথের পাথরের পঞ্চমুখী

বদ্রিনারায়ণ।

গুরুদেবের কৃপায় বদ্রিনারায়ণ যাইবার সৎসঙ্গিনী মিলিল কালীঘাট হইতে ১০ জন স্ত্রীলোক আসিয়া বিষ্ণু-পাদ-পদ্মে পিণ্ডদান করিতে যাইতেছেন। তাহাদের সকলের গৈরীক বসন পর দেখিয়া আমার মনে হইল ইহারা বদ্রিনারায়ণের যাত্রী। আমাদের পাড়াতেই তাহাদের বাসা হইয়াছিল।

বেলা ৫ টার সময় আমি সেই বাসায় গিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিয়া আমাকে তাহাদের সঙ্গে লইবার জন্য বলিলাম। আমাকে সঙ্গে লইবার জন্য তাহারা খুব আনন্দের সহিত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

তাহারা বলিলেন আজ রাত ৯ টার সময় ষ্টেশনে গিয়া থাকিব, ভোর ৬ টার ট্রেনে হরিদ্বার যাইব।

এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার যাইবার সমস্ত আয়োজন করিয়া লইতে হইবে। আমি বাড়ীতে আসিয়া কাপড়, কম্বল, মশারি, সাবু, ইসবগুল ইত্যাদি ঠিক করিয়া লইলাম।

অনেকে বলিল "অচেনা অজানা পরের সঙ্গে কেমন করে যাবে এই দুর্গম পথে"।

কিন্তু গুরুদেবের কৃপায় আমার মনে হয় এ জগতে পর কেহই নয়। একমাত্র গুরু যিনি তিনি জগতের সর্ব্বত্রই বিরাজিত আছেন, সমস্ত জীবের মধ্যে তিনিই প্রকাশিত আছেন তবে আমার পর কে? — বাস্তবিক যাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাহারা ঠিক গর্ভধারিণী জননীর মত, সহোদরা ভগিনীর মত কত আদর যত্ন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ইহার চেয়ে আপন আর কে হইবে?

৫ই বৈশাখ গুরু-পাদ-পদ্ম স্মরণ করিয়া বদ্রিনারায়ণ যাত্রা করিলাম।

আমরা ১১ জন স্ত্রীলোক আর একটী বালক ছড়িদার।

কাশী হইতে আরও দুইটী স্ত্রীলোক আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহারাও আমাদের সঙ্গিনী হইলেন, তাঁহাদের সঙ্গে অন্য সব লোক ছিল, তাহারা তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন না।

নবাবগঞ্জ হইতে একটী স্ত্রীলোক কন্যা ও পুত্রবধূ লইয়া আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন, তাঁরা লক্ষ্ণৌতে নামিবেন শুনিলাম নবাবগঞ্জে জাগ্রত শিব আছেন, তাঁহার পূজা দিতে গিয়াছিলেন।

সেই স্ত্রীলোকটী আমাকে বলিলেন "ভাই আপনারা বদ্রি-নারায়ণে যাইতেছেন, আমি এই পাঁচটী পয়সা দিলাম, বাবার পূজা দিয়া বাবাকে জানাইবেন, বাবা যেন আমাকে নিয়ে যান।

৬ই বৈশাখ আমরা বেলা ১০ টার সময় হরিদ্বারে পৌঁছিলাম।

ধর্ম্মশালায় থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া গঙ্গার ঘাটে যে সমস্ত দেব দেবীর মন্দির আছে তাহা সমস্ত দর্শন করিলাম। যাঁহারা পিণ্ডদান করিলেন তাঁহারা কুশাবর্ত্ত ঘাটে পিণ্ডদান করিলেন। গঙ্গা এখানে প্রায় একমাইল চওড়া, গোমুখী হইতে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পুনরায় কনখলের নীচের দিকে মিশিয়া এক স্রোত হইয়াছে।

হরিদ্বারে হরিপেড়ী, কুশাবর্ত্ত, বিল্বকেশ্বর, নীলপর্ব্বত, কনখল (দক্ষালয়) এই পাঁচটীকে প্রধান তীর্থ বলে।

হরিদ্বারের প্রধান ঘাটের নাম হরিপেড়ী এখানে বিষ্ণুর চরণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা ধর্ম্মশালায় আসিয়া রন্ধন করি   াহারাদি করিয়া বাজারে গেলাম, সেখান হইতে জুতা, মে   কাঠি, ছুঁচ, সুত, বিন্দি, ইত্যাদি কিনিয়া সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ও   দেবীর আরতি দেখিয়া সকলে বাসায় ফিরিলাম।

আমাদের সঙ্গে এক মা ও তাঁর মেয়ে দুই জনে ছিলেন সেই রাত্রে মেয়েটীর খুব জ্বর হইল।

পরদিন সকালে আমরা স্নান পূজা শেষ করিয়া, বাসে করিয় কনখল্ ও বিল্বকেশ্বর মহাদেব দেখিতে গেলাম। বিল্বকেশ্বরে একটা গুহার ভিতর বিল্বকেশ্বর শিবলিঙ্গ, দুর্গাদেবী, গনেশের মূর্ত্তি আছে অন্যদিকে পাহাড়ের নীচে গৌরীকুণ্ড নামে একটা কুণ্ড আছে।

নীল পর্ব্বত একটা ছোট পাহাড়, ইহার নিম্নে গঙ্গার স্রোত ধারা চলিয়াছে, সেই ধারাটাকে নীলধারা বলে। সেই নীল ধার দেখিয়া মন বিমোহিত হয়। এই স্থানেই নীলেশ্বর মহাদেব আছেন।

কনখলে দক্ষেশ্বর শিবের মন্দির আছে। এই   ন সতী পিতৃনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়া ছলেন।

আমরা বাসায় আসিয়া দেখিলাম মেয়েটীর জ্বর খুব বাড়িয়াছে ভুল বকিতেছে, দেখে আমাদের বড় ভয় হল। আমরা ধর্ম্মশালার ম্যানেজারকে বলিলাম, একজন ভাল ডাক্তার আনিবার জন্য।

ম্যানেজারটী খুব ভাল, তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনিলেন ডাক্তার থার্মোমিটার দিয়া দেখিয়া বলিলেন ১০৬ ডিগ্রী জ্বর মাথায় বরফ দিতে হবে। আমি কিছু ঔষধ পাঠাইয়া দিব দুই ঘন্টা অন্তর ঔষধ খাওয়াইবেন   তাহাতে জ্বর কমিবে।

না হলে তোমার দর্শন পাওয়া যায় না। দয়াময় তুমি [illegible] দয়া করিয়া দেখা দাও, সেই তোমার চরণ দর্শন করিতে পা[illegible] মানুষের ইচ্ছা ও চেষ্টায় কিছুই হয় না।"

[illegible] ও [illegible]মেয়েটি যে পূজার দ্রব্যগুলি এনেছিলেন, সেই সকল দ্রব্যগুলি ও কিছু টাকা আমাদের দিয়ে বলিলেন "তোমরা [illegible] পূজা দিও"।

আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিনয় [illegible] হৃষিকেশ যাত্রা করিলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল দয়াময় যতক্ষণ না তোমার চরণ দর্শন পাই; ততক্ষণ দর্শনের আশা নাই

হৃষিকেশ।

সন্ধ্যার আগে আমরা হৃষিকেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। পাঞ্জাবীর ধর্মশালায় আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইল।

সন্ধ্যার সময় আমরা হৃষিকেশ, [illegible]জিউ রামসীতার মন্দির [illegible] দর্শন করিয়া, গঙ্গার ধারে আসিয়া বসিলাম। গঙ্গার [illegible] তরঙ্গ বহিতেছে।

বড় বড় মাছ সব তীরে আসিয়া খেলা করিতেছে। [illegible] স্থানে মাছ কেহ ধরে না। সেই জন্য মাছ গুলি [illegible] হইয়া খেলা করে। মাছের গায়ে হাত দিলে ভয় পায় না। [illegible] করিয়া জলে ফেলিয়া দিলে হাঁ করিয়া খাইয়া ফেলে।

হৃষিকেশের গঙ্গার চঞ্চল তরঙ্গ ক্রীড়া দেখিতে বড়ই সুন্দর। আমরা গঙ্গাতীরে বসিয়া সন্ধ্যা-জপ শেষ করিয়া [illegible] ফিরিলাম।

৪।৫ মাইল চলিতাম। ফুলবাড়ী চটীর পর হইতে-

চটীর নাম।	মাইলের সংখ্যা।
ঘট্‌গাড়্‌	২
নাই মোহন	৩ জলের খুব ধা ।
বিজনী	৩ চড়াই।
কুণ্ড	৩।০
বন্দর ভেল	৩ ওৎরাই।
মহাদেব	৩।০
সেমল	৩।।০
কাণ্ডী	৩
ব্যাস ঘাট	ওৎরাই, হাসপাতাল ডাকঘর আছে।
ছালতী	[illegible]
উমরাসু	১।০
দেবপ্রয়াগ	২।।০

এই সব চটী পার হইয়া আমরা ১২ই বৈশাখ ১০।১১টার সময় দেবপ্রয়াগে পৌঁছিলাম। এই স্থানে ভাগিরথী অলক নন্দার সঙ্গম স্থান। এখানে রঘুনাথ দেবের দর্শন ও পিণ্ড দান। প্রয়াগ তীর্থ বলিয়া এখানে অনেকে মস্তক মুণ্ডন করেন। আমিও আর একজন সঙ্গমে স্নান করিয়া রামসীতা, গরুড় দেব দর্শন করিলাম আর সকলে মস্তক মুণ্ডন করিয়া স্নান পিণ্ড ভোজ্য দান, গুপ্ত দান করিলেন। এই সঙ্গম স্থলের দৃশ্য অতি মনোহর।

দেবপ্রয়াগে তারঘর, পোষ্টাফিস, থানা ও অনেক দোকান আছে, সব জিনিষ পাওয়া যায়। দেবপ্রয়াগে বদ্রী ও কেদার

নাথের পাণ্ডাদের বাড়ী।

বদ্রীনারায়ণের রাস্তা খুব খারাপ ও কঠিন অনেকের মুখে শুনিয়াছিলাম, পদব্রজে যাওয়া বড়ই কঠিন। সেইজন্য আমার মনে বড় ভয় হয়েছিল, আমার মত দুর্ব্বল লোক পদব্রজে যাইতে পারিবে না।

কিন্তু বদ্রীনারায়ণের কৃপায় রাস্তায় চলিতে কোন কষ্ট হয় নাই। বরং বোধ হয় কাণ্ডি, ঝাঁপান অপেক্ষা, পদব্রজে যাইতে বড়ই আনন্দানুভব হয়।

পর্ব্বত মালার অপূর্ব্ব শোভা। রাস্তার একদিকে পাহাড় আর একদিকে অলকনন্দা ভাগিরথী ভীষণ গর্জ্জন করিয়া প্রবাহিতা হইতেছেন। মনে হয় যেন পৃথিবীর সমুদয় তরঙ্গের শব্দ [illegible] আবার কোন স্থানে গঙ্গা নীরব।

পর্ব্বতের স্থানে স্থানে ঝরণার জল পড়িতেছে পিপাসীত পথিকগণ সেই জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিতেছে। [illegible] পাহাড়ের গায়ে উত্থান ভাবে প্রবাহিত অলকনন্দার জলকণার পুষ্ট শৈবাল সমূহের মরকত ছবি অতীব মনোহর

পর্ব্বতের উপর নানারকম ফুলের গাছ [illegible] গঙ্গা জলে পড়িয়া কাশীর চিনি দিয়া খাইলে [illegible] আমাশায় ভাল হয়। এই পাহাড় পথে আমাশায় রোগ প্রায় সকলের হয়।

পর্ব্বত পথে চলিবার সময় খুব সাবধানে চলিতে হয়, কারণ একদিকে পাহাড় আর একদিকে গঙ্গা সেই দিকে পড়িবার ভয় হয়। ঐ একটা রাস্তা ভিন্ন আর রাস্তা নাই। সেই জন্য ঐ রাস্তা দিয়া

মানুষ, গরু, ছাগল, ঘোড়া সকলকে যাইতে হয়। গরু, ছাগল, ঘোড়া সকল রাস্তা দিয়া যায় সেই সময় একেবারে পাহাড় ঘেঁসিয়া যাইতে হয়, নাহলে তাহারা এরূপ ধাক্কা দিয়া যায় যে তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইতে হয়, পাহাড়ের ধারে থাকিলে সেই খানেই বসিয়া পড়িবে। আর গঙ্গার দিক দিয়ে চলিলে ধাক্কা লাগিলে একেবারে গঙ্গায় গিয়া পড়িবে তার আর কোন চিহ্ন পাওয়া যাইবে না। সেই জন্য খুব সাবধানে পাহাড়ের ধার দিয়া যাইতে হয়।

কত রকম পাখী গাছে বসিয়া "বৌ কথা কও" "চোখ গেল" বলিতেছে।

পাহাড়ের ধারে ধান, গম, ,পেঁয়াজ শাক, কপি ইত্যাদি চাষ হয়।

আর স্থানে স্থানে কলাবাগান আছে। কাঁচ কলা, কলা পাকা, মোচা কিনিতে পাওয়া যায়।

রাস্তায় স্থানে স্থানে গরম দুধ, পেঁড়া, জলপান বিক্রয় হয়

পথে কাণ্ডি, ঘোড়া পাওয়া যায়। যাহাদের রাস্তায় চলিয়া পা ফুলিয়াছে ও বেদনা হইয়াছে আর চলিতে পারে না কিম্বা অন্য কোন কারণে শরীর অসুস্থ হয় সেইজন্য কাণ্ডি, ঘোড়া পথেই পাওয়া যায়। ইহাতে যাত্রীদের অনেক সুবিধা।

আমাদের সঙ্গের একজনের শ্রীনগরের পথে জ্বর হইল। তাঁহাকে চটীতে কাণ্ডি করা হইল। একেবারে উখীমঠ পর্যন্ত ১২৲ টাকা।

পাহাড়ের কোন রাস্তা, রাস্তা বেশ পরিষ্কার, সোজা, রাস্তা ভুল হইবার ভয় নাই।

১৭ই বৈশাখ আমরা নিম্নকেদারে আসিয়া বিশ্বেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া শ্রীনগরে আসিয়া কালী কমলীর ধর্ম্মশালায় থাকিলাম। সেখানে লক্ষীনারায়ণের মন্দির ও গঙ্গা আছেন। শ্রীনগর হইতে এক মাইল দূরে কালী, মহাদেব, অন্নপূর্ণা, গণেশ, গরুড়দেব ইত্যাদির দেবালয় সমূহ আছে।

শ্রীনগর বেশ সহর, এখানে পুলিশ, হাসপাতাল ডাক্তার, পোষ্টাফিস আছে। অনেক দোকান আছে। সব জিনিষ পাওয়া যায়।

শ্রীনগরের পর হইতে চটী।

চটীর নাম।	মাইলের সংখ্যা।
সুকর্ত্তা	৫
ভট্টিসেরা	২।•
ছাতিখাল	১
খাঁকরা	২॥• উৎরাই।
নরকোটা	২।• চড়াই ও উৎরাই।
গুলাবরায়	৩।•
ছগা	২ এখানে একটা দোলা আছে
রুদ্র প্রয়াগ	১ একটা পয়সা দিয়া চড়িতে হয়।

১৭ই বৈশাখ আমরা রুদ্রপ্রয়াগে আসিলাম, রুদ্রপ্রয়াগে অলকনন্দা মন্দাকিনীর সঙ্গম হইয়াছে। আমরা সঙ্গমে স্নান করিয়া মহাকালী, রুদ্রদেব, নারদেশ্বর শিব দর্শন করিয়া জলযোগ করি। সে দিনই রুদ্রপ্রয়াগ হইতে যাত্রা করিলাম।

মন্দিরের সম্মুখে একটা ধুনী জ্বলিতেছে শুনিলাম উহা চিরকাল প্রজ্বলিত থাকে ঐ ধুনীতে সকল যাত্রীদের কাঠ দিতে হয়। আমরা সকলে কাঠ দিলাম।

মন্দিরের বাহিরে পাঁচটি কুণ্ড আছে। লক্ষ্মী কুণ্ড, [illegible] কুণ্ড, সরস্বতী কুণ্ড, গৌরী কুণ্ড, [illegible] কুণ্ড। পাঁচটি কুণ্ডের জল মাথায় দিতে হয়। অনেক দেবদেবী আছেন।

কতকগুলি [illegible] আছে। আমরা [illegible] করিয়া সেইদিনই [illegible] হইতে যাত্রা করিলাম।

উঠিবার সময় যেমন চড়াই, নামিবার সময় সেইরূপ উৎরাই সেই সময় বৃষ্টিও খুব হইল। পাহাড়ের নিচে দাঁড়াইবার স্থান নাই।

রাস্তায় ঝরণার জল [illegible] জাঁতা করিতেছে। তাহার উপর একটি [illegible] তাহার মধ্যে একটি জাঁতা এমন ভাবে রাখিয়াছে, যে [illegible] ঘুরিতেছে. তাহাতে গম, যব ইত্যাদি পেষা হইতেছে।

বৃষ্টির সময় আমরা সেই ঘরে গিয়া আশ্রয় লইলাম। বৃষ্টি থামিলে আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম

সেদিন এমন হইল বৃষ্টি আর থামে না। রাস্তা চলিতে চলিতে আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। রাস্তায় দাঁড়াইবার স্থান নাই। ভিজিয়া রাস্তা চলিতে লাগিলাম। কারণ পাহাড় উপরে সন্ধ্যার পর চলা নিষেধ। খুব ভয়ের কারণ, অনেক রকম বিষাক্ত বিছা আছে তাহা কামড়াইলে মানুষ বাঁচে না।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আমরা গৌরীকুণ্ডে পৌঁছিলাম।

গৌরীকুণ্ডে তপ্তকুণ্ড ও গঙ্গা আছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ গৌরী শঙ্কর আছেন।

সেইদিন রাত্রে আমরা গৌরীকুণ্ডে থাকিয়া পরদিন সকালে কেদারনাথ যাত্রা করিলাম।

কেদারনাথের রাস্তা খুব চড়াই ও বরফ শুনিয়া আমি ও আর একজন কাণ্ডী করিলাম। গৌরীকুণ্ড হইতে কেদারনাথ দর্শন করিয়া, আবার গৌরীকুণ্ডে পৌছাইয়া দিবে, ৫৲ টাকা লইবে।

অন্নপূর্ণার চটীর পর হইতে, বরাবর কেদারনাথের তুষারাবৃত ধবলাগিরি দেখা যায়।

চিরবাসা ভৈরব হইতে চড়াই আরম্ভ, এইস্থানে দ্রৌপদী দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। সেইজন্য এখানে চিরবাসা ভৈরব আছেন। এখানে নূতন কাপড়ের চির দিতে হয়।

রামবাড়া হইতে খুব বরফের রাস্তা আর তেমনই চড়াই। সেইজন্য সকলে রাস্তায় চলিতে চলিতে বলিতেছে "জয় বাবা কেদারনাথ কি জয়"।

কর্ণ কেদারের ব্যবস্থা ও বেশ করেছেন। বরফের রাস্তা পার করিবার জন্য, রামবাড়াতে ৸০ আনা ১৲ টাকাতে অনেক কাণ্ডী পাওয়া যায়। অনেক যাত্রী কাণ্ডী করিয়া বরফের রাস্তা পার হইতেছে।

কেদারনাথের পাহাড় একেবারে বরফে মণ্ডিত। বরফের উপর দিয়া চলিতে বড়ই কষ্ট হয়। শুধু পায়ে চলিবার সময় পা ঝিম ঝিম করে—হাত পা সব অসাড় হয়ে যায়।

করিয়া ৩ বার, তারপর গোমুখী হইয়া ৩ বার গণ্ডুষ করিলাম।

মন্দিরের সম্মুখে কয়েকখানা ঘর আছে যাত্রীদের থাকিবার জন্য। একখানি ঘরে আমরা ছিলাম। ছড়িদার কাঠ জ্বালিয়ে আগুণ করিয়া দিল। আমাদের ১১ জনকে ১১ খানা কম্বল দিল দুইখানি করিয়া কম্বল লইয়া গিয়াছিলাম। কেদারনাথে ভয়ানক শীত। গরম জামা, সেমিজ, দুই তিন খানি কম্বল, ঘরে আগুন তবু শীতে কাঁপিতে হইতেছে।

আমরা পাণ্ডাকে বলিলাম "সন্ধ্যার সময় আমরা কেদারনাথের আরতি দেখিব।" পাণ্ডা বলিল "সন্ধ্যার সময় ঘর হইতে বাহির হইতে পারিবেন না। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে দেখিবেন, সমস্ত ঘর মন্দির বরফে ঢাকিয়া গিয়াছে।"

খাবারের দোকান দুই খানা আছে। বরফের উপর উনুন জ্বালিয়া খাবার তৈয়ারী করিতেছে। মরি মরি কেদারনাথের কি অপূর্ব্ব মহিমা।

লুচি ও জিলাপী ১ টাকা করিয়া সের বিক্রয় হইতেছে।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে দেখিলাম সত্য সত্যই কেদারনাথের মন্দির দুয়ারে আরম্ভ হইল পাণ্ডা তাড়াতাড়ি আমাদের ঘরের দরজা, জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

কেদারনাথে একদিনের বেশী কেহ থাকে না আমরা পরদিন সকালে কেদারনাথের দর্শন পূজা করিয়া, কেদারনাথ হইতে যাত্রা করিয়া বৈকালে গৌরীকুণ্ডে আসিয়া সেইদিন নালা চটীতে গিয়া রাত্রে থাকিলাম।

২৬শে বৈশাখ উখীমঠে আসিয়া পৌঁছিলাম। উখীমঠে কেদারনাথের গদি আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ, দুর্গা, মহাদেব, পঞ্চপাণ্ডব, গঙ্গা, যমুনা, প্রভৃতি অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে। একটা কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডের জল মাথায় দিতে হয়।

উখীমঠে অনেক দোকান আছে। হাসপাতাল, তার আফিস, পোষ্টাফিস ইত্যাদি আছে।

উখীমঠ হইতে চটী।

চটীর নাম।	মাইলের সংখ্যা।
গণেশ চটী	২॥০
পোথীবাসা	৫
চোপ্তা	২
পাঙ্গরবাসা	৪
মণ্ডল	১
গোপেশ্বর	৭॥০
চামলী	২

২৭শে বৈশাখ আমরা সন্ধ্যার সময় চামলী আসিলাম। চামলীতে অনেক দোকান তার আফিস, পোষ্টাফিস, কাছারী, হাসপাতাল আছে।

চামলী হইতে দুইটী রাস্তা একটা বদ্রীনারায়ণে, আর একটী কর্ণপ্রয়াগ হইয়া রামনগরে গিয়াছে।

পরদিন সকালে আমরা বদ্রীনারায়ণের পথে যাত্রা করিলাম।

চামলী হইতে চটী।

চটীর নাম	মাইলের সংখ্যা।
মঠ চটী	১॥০

চটীর নাম	মাইলের সংখ্যা।
ছিনকা	১৷৹
সিয়াসৈন	২
হাট্	১
চেবিনা	১

চেবিনা হইতে একটী পথ তুঙ্গনাথে গিয়াছে আর একটী পথ বদ্রীনাথে গিয়াছে।

চড়িদার সমস্ত যাত্রীদের তুঙ্গনাথে যাইতে নিষেধ করিল। তুঙ্গনাথের রাস্তা বড়ই কঠিন চড়াই ও বরফপূর্ণ। ওখানে কেহই যায় না। আর তুঙ্গনাথে গেলে বদ্রীনারায়ণে যাইতে বিলম্ব হইবে। সেইজন্য যাত্রীরা সকলে বদ্রীনারায়ণের পথে চলিয়া গেলেন।

চেবিনার পরে আমাদের সঙ্গে তুঙ্গনাথের পাণ্ডার দেখা হইল।

পাণ্ডা বলিল "মা তোমরা তুঙ্গনাথ দর্শন করিবে না?"

আমি বলিলাম "তুঙ্গনাথ যাইবার কোন রাস্তা? আর এখন যদি যাই, কখন সেখানে পৌঁছিব আর কখন ফিরিব?"

পাণ্ডা বলিল 'এই সময় গেলে বেলা ১০টার সময় তুঙ্গনাথ পৌঁছিয়া দর্শন পূজা করিয়া সন্ধ্যার আগে ফিরিয়া আসিবেন। ৩ মাইল চড়াই, ৩ মাইল ওৎরাই, নামিবার সময় খুব শীঘ্র নামিবেন।"

পাণ্ডার নিকট সমস্ত জানিয়া আমি সকলকে বলিলাম এত দূরে আসিয়া তুঙ্গনাথ দর্শন না করিয়া কোন মতেই যাওয়া হইবে না। আর আমরা কি এ পথে আসিতে পারিব? এখানে যে

বরফ চাল। সংগ পাহাড় অপেক্ষা তুঙ্গনাথে হাড় খুব উচ্চ, মনে হয় হাত বাড়াইলেই আকাশ পাওয়া যাইবে।

তুঙ্গনাথের মন্দিরের সম্মুখে ভৈরব আছেন প্রথম ভৈরবকে প্রণাম করিয়া তুঙ্গনাথ মহাদেবকে পূজা করিয়া সমস্ত দেবদেব দর্শন করিয়া, পাহাড়ের শোভা সন্দর্শন করিতেছি। তাহার পর কাণ্ডীওলারা আসিল। যাঁহারা কাণ্ডীতে ছিলেন, তাহারা দর্শন পূজা করিলেন। সকলেরই সেদিন একাদশীর উপ । পাহাড়ের উপর ২।৪ খানা খাবারের দোকান আছে। লুচি জিয়া দিল, আমি ও ছড়িদার খাইলাম।

তারপর সকলে তুঙ্গনাথ পাহাড় হইতে নামিলা ওৎরাই রাস্তা খুব শীঘ্রই নামিলাম।

যে চটীতে আমাদের দুইজন সঙ্গী এগিয়ে এসে . সেই চটীতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা সকলে আসিয়া পৌঁছিলা

২৯শে বৈশাখ সকালে আমরা গরুড় গঙ্গায় আসিয়া স্নান করিয়া, গরুড়দেব, নারায়ণ দর্শন করিলাম। এখানে গুপ্তদান ও ভোজ্যদান করিতে হয়।

গরুড় গঙ্গায় ডুব দিয়া পাথর তুলিতে হয় সেই পাথর ঘরে রাখিলে সর্প, বিছার ভয় থাকে না।

গরুড় গঙ্গা হইতে পাতাল গঙ্গায় আসিয়া আহারাদি করিলাম।

পিপুল কোটা হইতে চটীর নাম।

চটীর নাম	মাইলের সংখ্যা।
গরুড় গঙ্গা	৪
টঙ্গনা	২

চটীর নাম।	মাইলের সংখ্যা।
পাতাল গঙ্গা	২
গুলাব কোটী	২
কুমার চটী	২
খনোটী	১
ঝরকুলা	২
সিংহদ্বার	২
যোশী-মঠ	১

সেইদিন সন্ধ্যার সময় আমরা ঝরকুলা চটীতে আসিয়া রাত্রে থাকিলাম।

১০শে বৈশাখ সকালে আমরা যোশীমঠে আসিলাম।

যোশীমঠে শ্রীবদ্রীনাথ দেবের গদি আছে। এখানে নৃসিংহ দেব ও বাসুদেবের দর্শন ও দণ্ডধারায় স্নান করিতে হয়।

যোশীমঠে পুলিশ, তার অফিস, পোষ্টাফিস, হাসপাতাল, ধর্মশালা আছে। এখানে দেবালয় আছে। অনেক দোকান বাজার আছে।

পর্বতের সানুদেশে এই সুরম্য মঠটী শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত। এইটী তাঁহার প্রিয়স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মঠে অনেক প্রাচীন গ্রন্থ আছে।

যোশীমঠ হইতে বিষ্ণু প্রয়াগে আসিয়া গঙ্গা স্নান ও বিষ্ণু ভগবানকে দর্শন করিয়া ঘাট চটীতে আসিয়া আহারাদি করিলাম। এইখানে বিষ্ণুগঙ্গা প্রবল বেগশালী অলকানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে।

* এখানে অলকানন্দার এত বেগ যে ইহাতে নামিয়া স্নান করা বড়ই কঠিন। এখানে নদী গর্ভে ছোট পাহাড় থাকাতে একটী জলপ্রপাত হইয়াছে। এই স্থানের দৃশ্য অতীব মনোহর।

সেইদিন খুব বৃষ্টি হওয়ায় বেশী রাস্তা চলিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার সময় পাণ্ডুকেশ্বরে আসিয়া রাত্রে সেইখানে থাকা হইল।

পাণ্ডুকেশ্বরে পাণ্ডু রাজা তপস্যা করিয়াছিলেন। এখানে যোগ বদ্রীনাথ আছেন।

যোশীমঠ হইতে চটীর নাম।

চটীর নাম	মাইলের সংখ্যা।
বিষ্ণু প্রয়াগ	২
ঘাট	৩
পাণ্ডুকেশ্বর	২
শেষধারা	॥০
লামবাগ	২
হনুমান চটী	৫
শ্রীবদ্রীনারায়ণ	৪

৩১শে বৈশাখ সকালে পাণ্ডুকেশ্বর হইতে চলিতে আরম্ভ করিলাম।

সকলেরই ইচ্ছা সংক্রান্তির দিন ১২টার মধ্যে গিয়া বাবা বদ্রীনারায়ণকে দর্শন করিব।

ছড়িদার বলিল ১১॥০ সাড়ে এগার মাইল রাস্তা, বরফ ও ভয়ানক চড়াই, ১২টার আগে পৌঁছিতে পারিবেন না। ১২টার পর মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়। বরং হনুমান চটীতে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার সময় বদ্রীনারায়ণে পৌঁছিয়া আরতি দর্শন করিবেন।

আমরা বলিলাম "আজ সংক্রান্তি বাবাকে দর্শন করিয়া আহার [illegible] এই ইচ্ছা। এক্ষণে বাবা যদি দয়া করিয়া দর্শন দিয়া এই [illegible] পূর্ণ করেন। বাবার দয়া না হলে দর্শন পাওয়া যায় না।

এইস্থলে দুইটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক।

কলিকাতা হইতে দুটা বৃদ্ধা বাবাকে দর্শন করিবার জন্য [illegible] গিয়াছিলেন। পাটাগাড় চটীতে একজনের বসন্ত হইল। বসন্ত রোগীকে কোন কান্ডী, ডান্ডি, ঝাপান কেহই লইতে স্বীকার হইল না, দুইশত টাকা দিব বলিল তথাপি কেহই লইল না।

বৃদ্ধার সঙ্গে ভায়ে বৌ, আর প্রতিবেশী সব ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন আমরা এতদূরে এত আশা করিয়া আসিয়া দর্শন না করিয়া ফিরিব না।

বৃদ্ধাকে সকলে বলিলেন "তুমি এই চটীতে থাক। আমরা কেদারনাথ দর্শন করিয়া আসিয়া তোমাকে বদরীনারায়ণে লইয়া যাইব। এ কয়দিনে তুমি একটু সুস্থ হইবে। বৃদ্ধা সেই আশায় সেই চটীতে থাকিলেন।

সকলে কেদারনাথ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন বৃদ্ধার অবস্থা শোচনীয়। সর্ব্বাঙ্গে তিল রাখিবার স্থান নাই।

দেড়শত টাকায় একটা ঝাঁপান ঠিক করিয়া, ঝাঁপানওলা জানিতে না পারে যে বসন্ত রোগী। সেইজন্য বৃদ্ধার গায়ে মুখে কাপড় ঢাকা দিয়া লইল।

উখীমঠে আসিয়া ঝাঁপানওলা জানিতে পারিয়া বৃদ্ধাকে নামাইয়া দিল। অবশেষে বৃদ্ধাকে উখীমঠের হাসপাতালে রাখিয়া সকলে বদ্রীনারায়ণে গেলেন।

বৃদ্ধা কত আশা করিয়াছিলেন, কেদারনাথ দর্শন হইল না বদ্রীনারায়ণ দর্শন করিব। হায় অদৃষ্ট! বদ্রীনারায়ণও দর্শন হইল না। পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, আত্মীয় স্বজন সমস্ত থাকিতে, সুদূর পাহাড় পথে উখীমঠের হাসপাতালে থাকিতে হইল।

বৃদ্ধা পুত্রগণকে না বলিয়া নিজের গহনা বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া বদ্রীনারায়ণ দর্শনের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন।

"দয়াময় নারায়ণ কি পাপে বৃদ্ধার এ আকুল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন না?

[আর একজন বৃদ্ধা কেদারনাথ দর্শন করিয়া আসিয়া তাঁহার ভয়ানক রক্ত-আমাশয় হইয়া একেবারেই শয্যাগতা হইলেন

তাঁহাকে চামলীর হাসপাতালে রাখিয়া সঙ্গীরা সকলে বদ্রী নারায়ণ দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় চামলীর হাসপাতাল হইতে তাঁহাকে লইয়া সকলে কলিকাতায় গেলেন।

বৃদ্ধাদের সকাতরে রোদন শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মনে হয়, লীলাময়! তোমার একি অদ্ভুত লীলা!']

যাহা হউক, আমরা ৩১শে বৈশাখ হনুমান চটীতে রহিলাম না। হনুমানজীকে দর্শন করিয়া একেবারে বদ্রীনারায়ণ দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

রাস্তা ভয়ানক চড়াই ও মাঝে মাঝে রাস্তায় বরফ ঢালা। সেই সময় আবার একস্থানে লোহার পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যাত্রীদের যাইবার খুব অসুবিধা। কেবল মনে হইতে লাগিল, "বাবা তোমার একি পরীক্ষা। এই কঠিন পথ কেমন করিয়া

ত্‌ক্রম করিয়া তোমার চরণ দর্শন করিব? আর যে শক্তিতে
াইতেছে না! তুমি বল দাও, শক্তি দাও!

বাবা, অল্প আয়াসে ত তোমার চরণ দর্শন পাওয়া যায় না!
মি যে বড় সাধনার ধন!

তাই, তোমার দর্শন পথ এত কঠিন। কঠিন না হইলে
ক পাণ্ডবেরা সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে গিয়া, ভীম, অর্জ্জুন,
ল, সহদেব, দ্রৌপদী,—এই পর্ব্বত পথে স্থানে স্থানে দেহরক্ষা
রিয়াছিলেন। কেবল একমাত্র যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গারোহণ
রিয়া তোমার পাশে বিরাজ করিতেছেন।

আমরা অজ্ঞান মানব কেমন করিয়া তোমার এই লীলাভূমির
া বুঝিব?"

পাহাড়ীদের জন্য পাহাড়ের উপর একটা সরু রাস্তা আছে,
ই রাস্তা দিয়া পার হইতে হইবে,—আর কোন দিকে রাস্তা
াই। লোহার পুল সে সময় মেরামত হইতেছে। সেই রাস্তা
য়া আমরা অতি কষ্টে পার হইলাম। সেই রাস্তায় যদি একটু
া পিছলাইয়া যায়, তাহা হইলে একেবারে যুক্তবেণী অলকনন্দা
ন্দাকিনীতে গিয়া পড়িবে। তার আর কোন চিহ্নই পাওয়া
াইবে না। সেইজন্য খুব সাবধানে যাইতে হয়, আর সর্ব্বক্ষণ
াবা বদ্রী বিশাল লালকে স্মরণ করিয়া "জয় বদ্রী বিশাল লাল কি
য়" এই জয়ধ্বনি করিতে করিতে যাইতে হয়।

স্তব।

এস কৃপা কোরে, ভব পারাবারে,
পার কোরে দাও দয়াল ঠাকুর।
পথ ভয়ঙ্কর, কাঁপি থর থর,
কেমনে হেরিব চরণ তোমার ?
বড় ভয় মনে, যাইব কেমনে
তুষার পর্ব্বত, পাশে মন্দাকিনী।
বুঝেছি এবার, পরীক্ষা তোমার,
এ দাসীরে কত করিবে না জানি
চরণের আশা আমার ভরসা,
ওগো দয়াময় নামেতে তোমার
নাহি থাকে ভয়, বিঘ্ন দূরে যায়,
দুর্গমে সুগম হইবে আমার।
বিপদ ভঞ্জন, তুমি নারায়ণ,
বিপদ সময়ে রাখিয়ে জীবন
বদ্রীনারায়ণ, শ্রীমধুসূদন,
দেখাইও তব ও রাঙ্গা চরণ।

সেইদিন সকাল হইতে বরফের বৃষ্টি হইতেছিল। পাহাড় পথে কোথাও দাঁড়াইবার স্থান নাই। কাপড়, গায়ের বস্ত্র সমস্তই ভিজিয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থাতে প্রাণপণে সকলে ছুটিয়াছি, কখন বাবার চরণ দর্শন করিব।

যখন বাবার মন্দিরের চূড়া দর্শন হইল, সে সময় প্রাণে যে কি আনন্দ হল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। মনে হল পথের

সমস্ত ক্লান্তি এক নিমেষে দূর হইল। বাবা, তোমার মন্দিরের চূড়া দর্শনে প্রাণে এত শান্তি, এত আনন্দ, আনন্দময় না জানি তোমার চরণ দর্শনে কত আনন্দ পাইব!

বেলা ১॥০ টার সময় আমরা শ্রীধামে গিয়া পৌঁছিলাম। সে সময় বাবার মন্দিরের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আমরা একটু বিশ্রাম করিবার পর বেলা ৮ চারিটার সময় বাবার মন্দিরের দরজা খোলা হইল। সেই সময় সকলে দর্শন করিতে গেলাম।

বদ্রীনারায়ণের মন্দির পাথরের অতি সুন্দর। দরজার সম্মুখে গরুড়ের মূর্ত্তি। মন্দিরের দুইটা দরজা পার হইয়া বদ্রী-নারায়ণের মূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। সেদিন বাবার চরণ দর্শন হইল না।

স্তব।

জয় বদ্রীনারায়ণ, জয় নিত্য নিরঞ্জন,
যোগ মূর্ত্তি যোগাসনে,
লক্ষ্মী চামর ব্যাজন, বামে নর-নারায়ণ,
নারদ বাজায় বীণে
কুবের গরুড় দেব, করিছেন সবে স্তব,
সজিয়াছ দয়াময়
তব দেব লীলাভূমি, কেমনে বর্ণিব আমি,
হেরি মন হয় লয়!

চরণ পঙ্কজ হেরি, পুলকেতে প্রাণ ভরি,
অজ্ঞান রমণী আমি
তব পদে স্থান পাই, কাতরে জানাই তাই,
ওহে হৃদয়ের স্বামী।
জানি না ভকতি স্তব, পূজিব কেমনে
চাহি হৃদে দিন যামী,
চরণ ভরসা করি, ভবের কাণ্ডারী হ
তুমি অনাথার স্বামী।

পাণ্ডারা সমস্ত অঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কেবল মাত্র শ্রীমুখখানি দর্শন হইল।

নারায়ণের দক্ষিণে গণেশ, কুবেরদেব, গরুড়দেব, বাম কে লক্ষ্মী চামর ঢুলাইতেছেন, আর নরনারায়ণ মূর্ত্তি, নারদের মূর্ত্তি

মন্দিরের বাহিরে লক্ষ্মীর মন্দির লক্ষ্মীকেও বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

তাহার পর ভোগ বন্ধনের ঘর। তাহার পাশে ঘণ্টাকর্ণ ও ক্ষেত্রপালের মন্দির আছে।

মন্দিরের বাহিরে নারায়ণের কাছারী। নীচে গঙ্গা তীরের কাছে তপ্ত কুণ্ড। তপ্ত কুণ্ডের পাশেই নারদশীলা। গঙ্গাদেবীর মাঝে নৃসিংহ শিলা, বরাহ শিলা আর উপরে গরুড় শিলা ও কেদারেশ্বর এই সব দর্শন হইল।

পুরীর উত্তর ভাগে গঙ্গা তীরের নিকটে ব্রহ্ম কপালী তীর্থ। এখানে ভাতের পিণ্ড বিক্রয় হয়, সেই পিণ্ড কিনিয়া ব্রহ্ম কপালীতে

পূর্ব্ব পুরুষের পিণ্ড দান করিতে হয়। ব্রহ্ম কপালীতে পিণ্ড দান করিলে, আর কোথাও কখনও পিণ্ড দান করিতে হয় না।

সন্ধ্যার সময় নারায়ণের ভোগ হইল। ভোগের পর আরতি হইল। মরি! মরি! কিবা অপরূপ রূপ মধুর মূরতি! কিবা তাহার আরতি!

আরতি

(বন্দনা)

জয় জয় নারায়ণ জগতের পতি
এ বিশ্ব তোমারে সদা করিছে প্রণতি
তুমি অসীম সুন্দর, ভক্ত মন প্রাণ হর,
অপরূপ আকার প্রেমের মূরতি
ভক্ত হৃদয়ে রাজে তব প্রেম জ্যোতি!

অতুল রাতুল তব কমল চরণে
ভক্তি অশ্রু মম লহ প্রভু কৃপা গুণে।
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, তোমারে নমিছে তারা,
তপন প্রদীপ, তারকের মালা প'রে
এ পঞ্চ প্রদীপে প্রকৃতি আরতি করে।

প্রকৃতি তোমারে নাথ করিছে আরতি
এ আরতি অপরূপ তব প্রেম ভাতি।
জয় জয় বিশ্বপতি, তব চরণে প্রণতি,
জয় পূর্ণব্রহ্ম বিশ্বস্রষ্টা সনাতন
অনাদি অনন্ত তুমি সর্ব্বশক্তিমান।

কি দিয়ে করিব আমি আরতি তোমারে
জ্ঞানের আলোক জ্বালি দাওহে অন্তরে।
জ্ঞানের নয়ন ,   সব অজ্ঞানতা টুটে,
জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, নিববাসনা, নির্ভরতা,
... প্রদীপ মাঝে কাতরে ডুবিতা।

বড় আশা প্রাণে মম ওহে প্রেমময়
... তোমার ধামে আকুল হৃদয়!
তুমি ... গতি,   আজ করিতে আরতি,
আরতি মঙ্গলে, এস হে মঙ্গলময়
আর্তি সময়ে হৃদে হও হে উদয়।

আরতি দর্শন করিয়া আমরা বাসায় আসিলাম।

সেদিন পাণ্ডা আমাদের মহাপ্রসাদ দিল   অন্ন আর বেসন গুলিয়া তাহাতে লঙ্কা তেতুল দিয়া তাহা ঝোল বেসন দিয়া অন্ন ভাজা, আলুর তরকারি। পাতা পাওয়া যায় না, ভূজ্জপত্র ওখানে খুব সস্তা। সেই ভূজ্জপত্রে সকলকে খাইতে দিল। জগন্নাথের মত এখানে মহাপ্রসাদের জাতি বিচার নাই। সকলে একত্রে বসিয়া খাইতে হয়।

বদ্রীনারায়ণের পাহাড়, কেদারনাথের পাহাড়ের মত তুষারাবৃত নহে। স্থানে স্থানে বরফ আছে। কেদারনাথ অপেক্ষা শীত কম। ডুড়িদার তপ্ত কুণ্ডের জল আনিয়া দিত সেই জলে হাত মুখ ধোয়া হইত।

মরি শ্রীবৎস লাঞ্ছন, বক্ষে বক্ত ...
নমিতেছে ভক্ত নরনারী
তব শ্রীকর্ণে কুণ্ডল, নীল ... চল চল,
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধা...

বাবার চরণ দর্শন করিয়া, তপ্ত কুণ্ডে ... করিয়া, পঞ্চ ... পঞ্চ শিলা, কেদারেশ্বর ইত্যাদি দর্শন ক... পুনরায় বাবার মন্দিরে আসিয়া, বাবার পূজার জন্য যে সমস্ত ... হইয়াছিল, তাহা সমস্ত পাণ্ডার হাতে দেওয়া হইল। পাণ্ড... সমস্ত একটী থালার উপর রাখিয়া দিল। বাবাকে পূজা ক... করিতে দেয় না।

বাবার পূজার দ্রব্য বিশেষ কিছুই নয় যার ... রেসমী ধুতি চাদর, ফল, মেওয়া, লইয়া যাওয়া হইয়া... ওখান হইতে পাণ্ডা ছোলার ডাল, শুক্‌না নারিকে... কিনিয়া দিয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ের যে স্ত্রীলোকটী পূজা ... তাহারও পূজা দিলাম।

আরতি দর্শন করিয়া মন্দিরের বাহিরে ... সময়, লক্ষ্মী দে... পূজার দ্রব্য পূজারীর হাতে দিয়া আমরা দর্শন প্রণাম করিয়া ফিরিলাম।

সকালে নারায়ণের বাল্য ভোগ খিচুড়ী আলু সিদ্ধ হয় ... প্রসাদ সদাব্রতে সাধু ও গরীব দুঃখীরা খায়। আর ভোগ হয় না। একেবারে সেই সন্ধ্যার সময় ভোগ হয়।

বদ্রীনারায়ণে অনেক দোকান, মনোহারী, কাপড়ের, খাবারের সব দোকান আছে।

জিলাপী, মিঠাই সব এক টাকা সের, লুচি ৸৹ আনা সের, আলু ।৹ আনা সের, চাল ৸৶৹ আনা সের। বদরীনারায়ণের পথে সব চটীতেই আটা ঘি, চাল, ডাল, আলু, দুধ, গুড় পাওয়া যায়। বড় বড় চটীতে খাবার জিনিষ সব পাওয়া যায়। পাহাড় পথে কোন জিনিষের অভাব নাই।

বদরীনারায়ণে পোষ্টাফিস, তার আফিস ইত্যাদি আছে।

আমরা দেবপ্রয়াগ হইতে বদরীনারায়ণের ঠিকানা দিয়াছিলাম। বদরীনারায়ণে আসিয়া সকলে পত্র পাইলাম।

যাত্রীদের প্রতি বদরীনারায়ণে পাণ্ডাদের বিশেষ যত্ন নাই পাণ্ডুর দ্বার আছে।

আমরা তিন দিনের দিন বদরীনারায়ণ হইতে ফিরিলাম। ফিরিবার সময় বেশী কষ্ট হয় নাই।

পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় যাত্রীদের যাতায়াতের বড়ই কষ্ট হওয়ায়, রাস্তায় বড় বড় তক্তা পাতিয়া দিয়াছে সেজন্য ফিরিবার সময় যাত্রীদের কোন কষ্ট হয় নাই।

আমরা পুনরায় চলিত পথে বরাবর আসিয়া চামলী হইতে কেদারীর পথ ধরিলাম।

চামলী হইতে নন্দ প্রয়াগ ৭ মাইল। নন্দপ্রয়াগে নন্দ রাজা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। নন্দপ্রয়াগে অলকনন্দা ও নন্দা নদীর সঙ্গম স্থান— আমরা অলকনন্দা মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া যজ্ঞ কুণ্ড ও নন্দ রাজা দর্শন করিয়াই সেখান হইতে রওনা হইলাম।

নন্দপ্রয়াগ হইতে চটীর নাম।

চটীর নাম	মাইলের সংখ্যা।
সোনালা	৩
নন্দাস্ন	৩
জৈকণ্ডি	২
কর্ণ প্রয়াগ	৭॥০

কর্ণ প্রয়াগে কর্ণগঙ্গা ও অলকনন্দা মিলিয়াছেন।

এখানে কর্ণেশ্বর মহাদেব ও উমাশঙ্করী দেবীর দর্শন ও কর্ণ কুণ্ডে স্নান করিতে হয়। কর্ণের ও তাঁহার মহিষীর মূর্ত্তি আছে।

এখানে তারঘর, পোষ্ট অফিস, পুলিশ, হাসপাতাল, দোকান আছে। একটা রাস্তা রুদ্রপ্রয়াগে, আর একটা রাস্তা রামনগরে গিয়াছে।

আমরা আহারাদি করিয়া সেইদিনই কর্ণপ্রয়াগ হইতে রাম-নগর রওনা হইলাম। আমাদের ছ উদারটা সেইদিন কর্ণপ্রয়াগ হইতে বিদায় লইল।

কর্ণপ্রয়াগ হইতে চটী।

চটীর নাম।	মাইলের সংখ্যা।
সিমলী	৭
সিরোলী	২
ভটোলী	১
আদি বদ্রী	৭ চড়াই।
জঙ্গল চটী	৮ জঙ্গলের ভিতর রাস্তা
গোখাড় গদেরা	৪

চটীর নাম।	মাইলের সংখ্যা।
গৈরমেল	১ ওংরাই
ধুনার খাট	১ ওংরাই
মেল চৌরা	৬

আদি বদ্রীনাথে বদ্রীনারায়ণ আরও অনেক দেবদেবী আছেন। বদ্রীনারায়ণ হইতে ফিরিবার পথে আদি বদ্রীনাথ দর্শন করিতে হয়।

আমরা আদি বদ্রীনাথ দর্শন করিয়াই সেইদিনই ফিরিলাম।

মেল চৌরীতে আসিয়া সেইখানে সকলের কাণ্ডী, ডাণ্ডী, ঝাঁপান, মালকাণ্ডী সমস্ত বদলাইতে হয়।

আমরা সকালে মেল চৌরীতে আসিয়া আহারাদি করিয়া মালকাণ্ডী ও ডাণ্ডীওলাদের হিসাব করিয়া টাকা দেওয়া হইল। তাহাদের বিদায় দিয়া, মাল লইয়া যাইবার জন্য দুইটা ঘোড়া ৭৲ টাকা করিয়া দিতে হইবে, একেবারে রামনগরে পৌঁছাইয়া দিবে আমরা ভাড়া করিলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা মেলচৌরী হইতে রওনা হইলাম।

এখান হইতে ১ মাইল পন্নুয়াখাল তাহার পর ১॥০ মাইল সেমল ক্ষেত, তাহার পর ৫॥০ সাড়ে পাঁচ মাইল চৌপুটীয়া। এখানে পোষ্টাফিস ইত্যাদি আছে। এখান হইতে একটা রাস্তা দ্বারা হাট রাণীক্ষেত হইয়া কাট গুদাম গিয়াছে। অপর রাস্তাটী রামনগরে গিয়াছে।

চৌখুটীয়া হইতে চটী।

চটীর নাম।	মাইলের সং
মাসী	৬
বৃদ্ধ কেদার	৪
ভিখিয়াশৈন	৮ এখানে ও শ্রীকোটে গরুর গাড়ী পাওয়া যায়
শ্রীকোট	৩
গুজরঘাটা	৮ চড়াই
গোদি	৬ উৎরাই
টোটাআম	১॥০
কুমরিয়া	৬॥০ চড়াই
গরজিয়া	৬ উৎরাই
রামনগর	৮ ষ্টেশন

১৮ই জ্যৈষ্ঠ সকালে আমরা রামনগরে আসিয়া পৌঁছিলাম। রামনগরে গঙ্গা স্নান করিয়া, রামসীতা মহাদেব দর্শন করিয়া বাজার দোকান [illegible] হইলাম। রামনগরে ফলের দোকান অনেক। তরমুজ, খরমুজ, লিচু, অনেক রকম ফল, খুব সস্তা। অনেক লিচুর বাগান আছে।

ট্রেণ বেলা ২টায়। আমরা রামনগর হইতে নৈমিষারণ্যের টিকিট কিনিলাম। কারণ আমাদের সকলেরই নৈমিষারণ্য দর্শন হয় নাই।

নৈমিষারণ্য।

বেলা ১১টার সময় আমরা নৈমিষারণ্য আসিয়া পৌঁছিলাম। বেলা হওয়ায় সেদিন আর কোন কাজ হইল না। সকলে গঙ্গাস্নান

করিয়া গঙ্গার নিকটে যে সমস্ত দেবদেবী ছিলেন সেই সমস্ত দেব-দেবী দর্শন করিয়া পাণ্ডার বাড়ীতে থাকা হইল।

সেইদিন বৈকালে বেদব্যাস, স্তুতমুনি, পঞ্চ পাণ্ডব, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি দর্শন করিলাম। বেদব্যাস এই স্থানে বসিয়া মহাভারত লিখিয়া ছিলেন। নৈমিষারণ্যে অনেক মুনি ঋষির তপস্যার স্থান। একেবারে নির্জ্জন তপোবনের ন্যায়।

সন্ধ্যা বেলা ৮টার ট্রেনে আমরা ৺কাশীধামে যাত্রা করিলাম।

লাকসার ষ্টেশন হইতে আমার একেবারে গয়ার টিকিট হইল। আর সকলের হাওড়ার টিকিট হইল।

কাশীধাম।

কাশীধামে আসিয়া আমি দুই দিন ছিলাম। দশাশ্বমেধ ঘাটে ও মণিকর্ণিকায় স্নান হইল। বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, কেদারনাথ, সঙ্কটা প্রভৃতি দর্শন করিয়া আমাকে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইতে হইল। দেড় মাস একসঙ্গে কত আনন্দে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। এরূপ আনন্দের দিন বুঝি আর হইবে না। জননীর ন্যায় কত আদর যত্ন করিয়াছিলেন। সহোদরার মত কত ভাল বাসিয়া ছিলেন। সেই সব স্নেহময়ীদের নিকট হইতে বিদায় লইতে প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল। পথের সঙ্গিনীদের মনে হইত গর্ভধারিণী জননী ও সহোদরা ভগিনী।

এরূপ সৎসঙ্গ লাভ করিয়াছিলাম একমাত্র গুরুর কৃপায়।

রাজগৃহ ও নলন্দা।

গয়ায় চক্ রাস্তায় বাসে করিয়া বেহারসরীফ পর্য্যন্ত গিয়া তারপর ছোট লাইনে রেলে যাইতে হয় ২।৩ টা ষ্টেশন পরে রাজগৃহ ষ্টেশন। মাড়োয়ারি, জৈন, বৌদ্ধদের ৪।৫ টা ধর্ম্মশালা আছে যাত্রিদের থাকিবার কোন অসুবিধা নাই। রাজগৃহ স্বাস্থ্যকর স্থান অনেকে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়া থাকেন। ধর্ম্মশালায় ২।৩ মাস থাকিতে পারেন। ধর্ম্মশালা ভিন্ন আর কোন থাকিবার স্থান নাই। বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না।

পঞ্চ পাহাড় আছে। সমস্তই গরম জলের কুণ্ড। সপ্ত ধারা কুণ্ড, ব্রহ্ম কুণ্ড, সূর্য্য কুণ্ড ইত্যাদি। ঐ সমস্ত কুণ্ডে স্নান করিলে চর্ম্মরোগ ও অন্যান্য ব্যাধি সমস্তই ভাল হয়।

রাজগৃহে জরাসন্ধ রাজার রাজধানী ছিল। মাটী খুঁড়িয়া দুর্গের ভগ্নাংশ কিছু কিছু বাহির হইয়াছে।

রাজগৃহ সহর নহে, পল্লীগ্রামের মত, ধর্ম্মশালার নিকট মুদির দোকান আছে, ২।১ খানা খাবারের দোকান আছে। যাত্রীদের সে জন্য কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

রাজগৃহ হইতে নলন্দা, একটা ষ্টেশন পরে, সকালে ৬টার ট্রেণে গিয়া আবার ৩টার সময় রাজগৃহে ফিরিয়া আসা যায়।

নলন্দার মাটী খুঁড়িয়া বুদ্ধদেবের সময়ের ইউনিভারসিটির ভগ্নাংশ অনেক বাহির হইয়াছে সমস্ত পাথরের গাথনি। একটা খুব বড় পাতকুয়া বাহির হইয়াছে। সারনাথের মত একটা বাড়ী করিয়া মাটীর ভিতর হইতে যে সমস্ত জিনিষ বাহির হইয়াছে সে

সমস্ত মিউজিওমের মত রাখা হইয়াছে। এখনও মাটী খোঁড়া হইতেছে। নলন্দার জৈনদের মন্দির আছে। আমি নলন্দা হইতে সেই দিনই ফিরিয়া রাজগৃহে আসিয়া ৮ দিন ছিলাম।

বক্রেশ্বর।

দুবরাজপুর ষ্টেশনে নামিয়া গরুর গাড়ী করিয়া বক্রেশ্বর যাইতে হয়। সঙ্গে কেহই ছিল না একমাত্র গুরুপাদ-পদ্ম স্মরণ করিয়া তাঁহারই আকর্ষণে যাত্রা করিলাম। আমার গুরুদেবের আদেশে "তীর্থ দর্শন" তিনিই আমার জীবনের একমাত্র সাথী ও পথ প্রদর্শক।

বেলা ২টার সময় দুবরাজপুরে নামিয়া একখানি গরুর গাড়ী করিয়া বেলা ৫টার সময় বক্রেশ্বরে আসিয়া পৌছিলাম। বক্রেশ্বরে সমস্ত গরম জলের কুণ্ড। শ্বেতগঙ্গা বৈতরণী প্রভৃতি আছে। শ্বেত গঙ্গায় স্নান করিয়া, বক্রেশ্বরের মন্দিরে বক্রেশ্বরের পূজা দর্শনাদি করিয়া, কালীর মন্দির প্রভৃতি দর্শন পূজা করিয়া গুরুপদ পাণ্ডার বাড়ীতে আসিবামাত্র ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি। পাণ্ডা খুব ভাল খুব যত্ন করিয়া স্থান দিয়াছিলেন। কোন রকম উৎপীড়ন নাই।

বক্রেশ্বর গ্রামটী খুব ছোট। শিবরাত্রির সময় খুব মেলা হয়। সেই সময় অনেক যাত্রী আসে।

পরদিন সকালে আমি দুবরাজপুরে প্রত্যাগমন করিলাম। দুবরাজপুরের পর্ব্বতটী খুব সুন্দর মনোরম স্থান, গুহার মধ্যে থাকিবার ঘর আছে আমি তিন দিন সেই গুহার মধ্যে ছিলাম।

রাধাগোবিন্দকে লইয়া গিয়াছিলেন, মন্দির ভগ্নাবস্থায় পড়িয়াছিল। বর্দ্ধমানের রাজা সেই মন্দির নূতন করিয়া রাধাগোবিন্দ স্থাপিত করিয়াছেন। প্রত্যহ ঠাকুরের সেবা পূজা ভোগাদি হয়।

জয়দেবের শিবের মন্দির ও সাধনার স্থান আছে। সম্মুখে নদী, স্থানটি বড়ই নির্জ্জন মনোরম।

কিছুদূরে কাঙ্গাল ঠাকুরের সমাধি মন্দির আছে। পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে খুব মেলা হয় অনেক লোকের সমাগম হয়। অনেকের মুখে শুনিয়াছি ঠাকুরের খিচুড়ী ভোগ এক বৎসর মাটিতে প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। পর বৎসর মেলার সময় যখন খিচুড়ী তোলা হয় তখনও গরম থাকে। ঠাকুরের আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য।

কামাখ্যা।

আমিনগাঁ হইতে ষ্টীমারে উঠিয়া পাণ্ডুতে নামিয়া বাসে যাইতে হয়। কামাখ্যা পর্ব্বতে কামাখ্যা দেবী আছেন, দশ মহাবিদ্যার দশটী পাহাড় আছে, এক একটী পাহাড়ে এক একটা মূর্ত্তি আছে। নীল পর্ব্বতে ষোড়শী মূর্ত্তিতে কামাখ্যা দেবী সিংহের উপরে অষ্টাদল পদ্ম শব—শবরূপে আছেন তার উপর দেবী চতুর্ভুজা মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত এখানে দেবীর যোনী মুদ্রা, ও কামেশ্বর শিব দর্শন। কামাখ্যা মন্দিরে কমলা ও মাতঙ্গিনী যোনী মুদ্রা তাঁদের ঢেকে ঢাকা আছেন। কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, বগলা ধূমাবতী, ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, রাজরাজেশ্বরী, সমস্তই মাতৃযোনী, মূর্ত্তি নাই—ঐ স্থানে সকলের ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে হয়। ভুবনেশ্বরীর পাহাড়ের উপর হইতে অপূর্ব্ব দৃশ্য। ব্রহ্মপুত্রের উপর

অসংখ্য নৌকা ষ্টীমার চলিতেছে। ব্রহ্মপুত্রের মাঝে একটা দ্বীপ আছে সেই দ্বীপের উপর উমানন্দ ভৈরব আছেন। নৌকা করিয়া উমানন্দ ভৈরব দর্শন করিতে হয়। কামাখ্যা মন্দির হইতে কিছু দূরে বাসে যাইতে হয় সেখানে বশিষ্ঠ আশ্রম ও অশ্ব—ক্রান্ত দর্শন করিতে হয়। বশিষ্ঠ আশ্রমে বশিষ্ঠ দেব এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। এইস্থানে শিবলিঙ্গ আছেন। কামাখ্যায় সৌভাগ্য কুণ্ড, ঋণ মোচন কুণ্ড আছে। সৌভাগ্য কুণ্ডে স্নান করিতে হয়।

কামাখ্যায় অনেক কুমারীরা যাত্রীদের নিকট পয়সা চাহে। কামাখ্যায় কুমারী পূজা করিতে হয় এ পূজায় ভক্তের প্রাণে বড়ই আনন্দ অনুভব হয়। মনে হয় সত্যই মা কুমারী মূর্ত্তিতে ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতেছেন।

আমরা কামাখ্যা দর্শন করিয়া ৺চন্দ্রনাথ দর্শনের জন্য যাত্রা করিলাম।

৺চন্দ্রনাথ।

সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে নামিলে ৺চন্দ্রনাথ যাইবার যে রাস্তা আছে, তাহার পার্শ্বেই ক্ষেমেশ বাবুর কালী বাড়ী আছে, এখানে মায়ের প্রত্যহ পূজা হয়।

কালী বাড়ী হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে রাস্তার উত্তর পার্শ্বে শনি ঠাকুর বিগ্রহ আছেন—পূজা হয়।

ব্যাসকুণ্ড ও ব্যাসাশ্রম এখান হইতে তীর্থের আরম্ভ। এই কুণ্ডে স্নান তর্পন পিণ্ডদান করিতে হয়। মন্দিরে ব্যাসদেব, ভৈরব, চণ্ডি ও ব্যাসেশ্বর শিব দর্শন পূজা করিতে হয়।

স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরে যাওয়ার পথেই জ্যোতির্ময় এইখানে সর্বদা পাষাণ গাত্র হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছে। জ্যোতির্ময়ের উপরেই দশভূজা ও ভবানী মন্দির এখানকার পীঠস্থান ভবানী রূপে বিরাজিতা, প্রত্যহ মায়ের পূজা, ভোগ আরতি হইয়া থাকে। দর্শন পূজা করিতে হয়। অষ্টশক্তি সমাযুক্ত জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গ দর্শন পূজা করিতে হয়।

চন্দ্রশিলা ও ঊনকোটী শিব, কপিলাশ্রম অতিক্রম করিয়া ঊনকোটী শিব দর্শন-পথ অতি দুর্গম- ওখানে যাওয়া বড় কষ্টকর পাহাড়ের শিকড় ধরিয়া উঠিতে হয়। পাণ্ডা বলিলেন একজন যাত্রী উঠিতে গিয়া পড়িয়া মারা যায় সেইজন্য পাণ্ডার জেল ও জরিমানা হইয়াছিল সেইজন্য এখন আর কোন যাত্রীকে পাণ্ডারা লইয়া যাইতে সাহস করে না। আপনারা যাইবেন না। "আমরা বলিলাম আপনি যদি না যাইতে পারেন আমাদের পথ দেখাইয়া দিন আমরা যাইব।" আমাদের "ঊনকোটী শিব" দর্শনের আগ্রহ দেখিয়া পাণ্ডা আমাদের সঙ্গেই গিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডা খুব ভাল আমাদের খুব যত্নের সহিত সমস্ত দর্শন করাইয়া ছিলেন ও খুব যত্ন করিয়াছিলেন। আমরা পাহাড়ের শিকড় ধরিয়া উঠিয়া ঊনকোটী শিব দর্শন করিলাম। বড়ই দুর্গম পথ এই পথ অতিক্রম করিয়া প্রত্যহ "ঊনকোটী শিবের" পূজা হইতে পারে না। সেইজন্য ঊনকোটী শিব নিজের পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মন্দাকিনীর একটী শাখা প্রবাহিত হইয়া ঊনকোটী শিবলিঙ্গের উপর সর্বদা জলধারা দিতেছে, দৃশ্য অপূর্ব মনোরম।

ঊনকোটী শিবের অনতিদূরে ভীষণ দুর্গম পথে পূর্ব দক্ষিণে অল্প উঠিলেই বিরূপাক্ষ শিব মন্দিরে যাইবার রাস্তা পাওয়া যায়।

শিবকুণ্ড, সূর্য্যাকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, গুরুধুনী, বিদ্যমান। লবণাক্ষের কিছু পূর্ব্বে মন্দাকিনীর একটী ধারা, সহস্র ধারা হইয়া ভীম পর্ব্বত হইতে নিম্নে পড়িতেছে। পুরুষগণ হরিধ্বনি এবং মহিলাগণ উলু ধ্বনি করিলে দ্বিগুণ বেগে জল পর্ব্বত হইতে নিম্নে হু হু শব্দে পড়িতে থাকে। দৃশ্য বড়ই আনন্দজনক। পশ্চিমে বেলা চুম্বিত অনন্ত প্রসারিত সুনীল ফেনিল সলিল সম্পদ পূর্ণ বঙ্গোপসাগর অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে বিরাজিত। পূর্ব্বে অসংখ্য জঙ্গলপূর্ণ পল্লী, উত্তরে দক্ষিণে নিবিড় নীরদ শ্যাম অনন্ত পর্ব্বত শ্রেণী। কোথাও সুন্দর জলাশয়—সুরম্য বন উপবন প্রাকৃতিক অপূর্ব্ব দৃশ্যের বিকাশ করিতেছে। কোথাও স্বচ্ছ সলিল নদী—তৃণাদি পূর্ণ বন ভূমির প্রান্তদেশে শোভা পাইতেছে। কোথাও সলিল ও পাষাণ বক্ষে অস্থির বিচিত্র ক্রীড়া সহস্র ধারার জল প্রপাত, অনেক বনের মনোহর দৃশ্য, আবার গগনচুম্বী শৈল শৃঙ্গোপরি ৺চন্দ্রনাথ, বিরূপাক্ষ ও স্বয়ম্ভুনাথ দেবের মন্দির উন্নত শিরে দণ্ডায়মান। যাত্রীগণের বম্ বম্ বম্ ধ্বনি হৃদয় তারে প্রতিধ্বনি করিতেছে। তীর্থস্থান দর্শনে সাধকের হৃদয়ের ভক্তিস্রোত উচ্ছ্বাসিত হইবে, তাই বুঝি "তীর্থ-দর্শন" গুরুদেবের আদেশ বাণী।

ত্রিবেণী।

ত্রিবেণী যাইতে হইলে ব্যাণ্ডেলে গাড়ী বদল করিয়া মগরা ষ্টেশনে নামিয়া ওখান হইতে একটী ছোট রেল গাড়ী একেবারে ত্রিবেণীতে নামাইয়া দেয়। ইহাতে বেশী হাঁটিতে হয় না।

গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলন হইয়া ত্রিধারা বহিতেছে। ত্রিধারায় স্নান করিতে হইলে নৌকা করিয়া ত্রিধারায় যাইতে হয়।

মকর সংক্রান্তিতে ও মাঘ মাসে কল্পবাস করিতে [illegible] লোকের সমাগম হয়।

ত্রিবেণীর গঙ্গার জল স্বচ্ছ সুস্নিগ্ধ ও এরূপ সুমিষ্ট জল আর কোথাও নাই। ত্রিবেণী স্থানটা বড়ই মনোরম—শান্তিময়, গেলে আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। দুইবার গিয়াছি আবার মনে হয় নাই। তথায় অনেক সাধুরা আশ্রম করিয়া সেই আশ্রমে বাস করিতেছেন। গঙ্গার উপরে যোগমায়ার আশ্রম, শ্যামা মায়ের আশ্রম। গঙ্গার উপরে গাছের তলায় একটা সাধু বাবার কুটীর আছে। বেণীমাধবের পশ্চাতে যোগাচার্য্যের আশ্রম। কিছুদূরে জ্ঞানানন্দ ঠাকুরের শান্তিধাম ও মাতৃ আশ্রম আছে।

বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়। ধর্ম্মশালা আছে তাহা ভাড়া দিয়া থাকিতে হয়। আমি সাধু মায়ের ঘর ভাড়া লইয়া ছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে কন্যার মত অকৃত্রিম স্নেহ যত্ন করিয়া নিজের শয়ন কক্ষে আমাকে রাখিয়াছিলেন। আমার চার দিন থাকিবার কথা ছিল কিন্তু তাঁহার স্নেহ-যত্নে আমি এক মাস ছিলাম। আমার নিকট হইতে ভাড়া লন নাই। আবার একবার ত্রিবেণীতে সাধু মায়ের বাড়ীতে গিয়া ৬।৭ দিন ছিলাম।

ত্রিবেণীতে দোকান বাজার মাছ তরকারি সব জিনিষ পাওয়া যায় কোন জিনিষের অভাব নাই।

বেণীমাধবের মন্দির। গঙ্গার ঘাটে অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে। কিছুদূরে বাঁশবেড়ে হংসেশ্বরী আছেন।